মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী-এর মুখপত্র

ত্রৈমাসিক

ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স

JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE

বর্ষ : ০১, সংখ্যা : ০২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ঈ.

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ:
ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবনা

শরীয়াহ বোর্ডরুমের নানা অভিজ্ঞতা:
কিছু বাস্তব শিক্ষা ও পর্যালোচনা

সরকারী সুকুক:
গভর্নেন্স ও নীতিগত কাঠামো বিষয়ক গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ

‘মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী’-এর মুখপত্র

ত্রৈমাসিক

ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স

JOURNAL OF ISLAMIC ECONOMICS AND FINANCE

বর্ষ : ০১, সংখ্যা : ০২, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০২৫ ঈ.

প্রতিষ্ঠাকাল

জিলহজ্ব ১৪৪৬ হি., জুন ২০২৫ ঈ.

পৃষ্ঠপোষক

ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান দা. বা.
মুফতী আতিকুর রহমান খান দা. বা.

সম্পাদক

মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম দা. বা.

নির্বাহী সম্পাদক

মুফতী আহসানুল ইসলাম
মাওলানা মুহাম্মদ সানাউল্লাহ

সহযোগিতায়

আইএফএ কনসালটেন্সি, আদল অ্যাডভাইজরি

বিনিময় : ২৫ (পঁচিশ) টাকা মাত্র

ঠিকানা

বাড়ি ০৭, রোড ০৪, ব্লক-এইচ, বনশ্রী (মেরাদিয়া বাজার সংলগ্ন), রামপুরা, ঢাকা- ১২১২

যোগাযোগ +8801997-702078

fb.com/ciesbd.org
info@ciesbd.org
https://ciesbd.org/

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ০২
অর্থনীতির সবক: আল-কুরআনুল কারীম থেকে ০৩
অর্থনীতির সবক: আল-হাদীস থেকে ০৩
ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবনা ০৪
মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম, কিমিয়া সা’দাত
শরীয়াহ বোর্ডরুমের নানা অভিজ্ঞতা: কিছু বাস্তব শিক্ষা ও পর্যালোচনা ১৪
ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান
সরকারী সুকুক: গভর্নেন্স ও নীতিগত কাঠামো বিষয়ক গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ ১৮
বাই নাউ পে লেটার: পরিচিতি ও শরীয়াহ বিধান ২৭
মুফতী সাজ্জাদুর রহমান
ইসলামে ঋণের রীতিনীতি ও বর্তমান পরিস্থিতি ৩২
মুফতী আহসানুল ইসলাম
মাহে রমযান ও আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ৩৫
মাওলানা মুহাম্মদ সানাউল্লাহ
আপনার জিজ্ঞাসা ৩৮
ইসলামী অর্থনীতির ব্যক্তিত্ব পরিচিতি ৩৯
ইসলামী অর্থনীতির গ্রন্থ পরিচিতি ৩৯
মারকাযু দিরাসাতের দিন রাত্রি ৪০

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশে শরীয়াহ গভর্নেন্সের নতুন দিগন্ত: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাম্প্রতিক নীতিমালা ও আমাদের প্রত্যাশা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

বাংলাদেশে ইসলামী ব্যাংকিং খাতের পথচলা দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। দেশের বিশাল এক জনগোষ্ঠী তাদের কষ্টার্জিত আমানত ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শরীয়াহর বিধান পরিপালনকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। তবে এই দীর্ঘ পথচলায় একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত শরীয়াহ গভর্ন্যান্স কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা সবসময়ই অনুভূত হয়েছে।

আনন্দের বিষয় হলো, বর্তমান ২০২৬ সালের শুরু থেকেই বাংলাদেশ ব্যাংক (কেন্দ্রীয় ব্যাংক) ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনাকারী ব্যাংকগুলোর জন্য 'শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি' (SSC) গঠন, সদস্য নিয়োগ ও দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে অত্যন্ত যুগোপযোগী ও বিস্তারিত নীতিমালা প্রদান করেছে । আইবিআরপিডি (IBRPD) সার্কুলার নং-০১ (২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫) এর মাধ্যমে জারি করা এই নীতিমালাটি দেশের ইসলামী ব্যাংকিং ইতিহাসে একটি মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সার্কুলার অনুযায়ী এটি চলতি মাসের ১লা জানুয়ারী থেকে কার্যকর হয়েছে।

এর আগে ২০০৯ সালের নীতিমালায় শরীয়াহ বোর্ড বিষয়ক নীতিমালা ছিল, তবে সেটি আরও সমৃদ্ধ করা হয়েছে এই সার্কুলারের মাধ্যমে। নতুন এই নির্দেশনায় একটি 'Independent Shariah Supervisory Committee' বা স্বতন্ত্র শরীয়াহ সুপারভাইজরি কমিটি গঠনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই কমিটির প্রধান কাজ হবে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় শরীয়াহ নীতি প্রণয়ন করা এবং ব্যাংকগুলো তা সঠিকভাবে পরিপালন করছে কি না, তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা।

এই নতুন নির্দেশনার একটি বিশেষ দিক হলো সদস্যদের যোগ্যতা ও নিরপেক্ষতার কঠোর মানদণ্ড। নির্দেশনায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, কমিটির সদস্যদের অবশ্যই শরীয়াহ ও ইসলামী ব্যাংকিং সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞানসম্পন্ন এবং ইসলামী আইনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হতে হবে। একইসাথে স্বার্থের সংঘাত (Conflict of Interest) এড়াতে সদস্যদের নিরপেক্ষতা এবং নির্দিষ্ট কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক পদের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকার যে ঘোষণা নিতে হয়, তা শরীয়াহর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে। পাশাপাশি একই সদস্য এক সাথে তিনটির অধিক ইসলামী ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড এ না থাকার বিধি রাখাও প্রশংসাযোগ্য।

আমরা বিশ্বাস করি, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এই সময়োপযোগী হস্তক্ষেপ বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংকিং খাতকে আরও বেশি পেশাদার এবং শরীয়াহর মানদণ্ডে উত্তীর্ণ করতে সহায়ক হবে। যখন একটি ব্যাংকের শরীয়াহ বোর্ড স্বাধীনভাবে কাজ করার আইনি ভিত্তি পায়, তখন বিনিয়োগকারী ও আমানতকারীদের আস্থা বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। এই নীতিমালার সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা গেলে আমাদের দেশের ব্যাংকিং খাতে সুদযুক্ত ও সন্দেহজনক লেনদেন বর্জন করে একটি প্রকৃত ইনসাফভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে।

পরিশেষে, আমরা আশা করি সকল তফসিলি ব্যাংক এই নতুন নীতিমালার আলোকে তাদের শরীয়াহ বোর্ড পুনর্গঠন করবে এবং কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং প্রকৃত অর্থেই শরীয়াহর আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে হালাল উপার্জনের পথে অবিচল থাকার তৌফিক দান করুন। আমীন।

মুফতি আব্দুল্লাহ মাসুম - ১২/০১/২০২৬

অর্থনীতির সবক
আল কুরআনুল কারীম থেকে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী,

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ، وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

‘হে মুমিনগণ, আমি তোমাদেরকে জীবিকারূপে যে উৎকৃষ্ট (হালাল) বস্তুসমূহ দিয়েছি, তা থেকে (যা ইচ্ছা) খাও এবং আল্লাহর শোকর আদায় করো, যদি সত্যিই তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত করে থাকো।’ (সূরা বাকারা : ১৭২)

এই আয়াতের সুস্পষ্ট বার্ত হলো, যদি কেউ নিজেকে আল্লাহর ইবাদতকারী মনে করে, যদি এক আল্লাহর বান্দা হিসাবে নিজেকে প্রমাণ করতে চায়, তবে অবশ্যই তাকে হালাল উপার্জন করতে হবে। হারাম বর্জন করতে হবে।

আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর মুমিন বান্দাদেরকে হালাল গ্রহণ ও হারাম বর্জনের আদেশ করেছেন যদি তারা তাঁর বান্দা হয়ে থাকে। হালাল গ্রহণ দোয়া ও ইবাদত কবুল হওয়ার মাধ্যম। অপরদিকে হারাম গ্রহণ দোয়া ও ইবাদত কবুল না হওয়ার কারণ। (ইবনে কাসীর, ১/৩৫০)

এই আয়াত আরো বার্তা দেয়, হালাল ভক্ষণ ইবাদতে সহায়ক। তাফসীরে ইবনে কাসীরে অন্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আছে,

إن الحلال عون على العمل الصالح

‘হালাল ভক্ষণ নেক আমলের সহায়ক।’ (ইবনে কাসীর ৫/৪১৫)

সালাফ থেকে বর্ণিত আছে,

إذا أكلت الحلال أطعت الله شئت أو أبيت، وإذا أكلت الحرام عصيت الله شئت أو أبيت.

‘যখন তুমি হালাল ভক্ষণ করবে, তখন তুমি চাও বা না চাও আল্লাহর আনুগত্য করবে। আর যখন হারাম ভক্ষণ করবে, তখন ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পাপাচারে লিপ্ত হবে। (আল হাস আলাত তিজারাহ, পৃ. ৭)

অর্থনীতির সবক
আল হাদীস থেকে

হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

والذي نفسي بيده ... لأن ياخذ أحدكم ترابا فيجعله في فيه، خير له من أن يجعل في فيه ما حرم الله عليه.

‘সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন, এমন কিছু নিজ মুখে দেওয়ার চেয়ে মুখে মাটি দেওয়া অনেক ভালো।’ (মুসনাদে আহমাদ, মুআসসাতুল রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ ইং., খ. ২, পৃ. ২৫৭)

কোনো কিছুর গুরুত্ব ও নিশ্চয়তা বোঝানোর জন্য বাক্যে ‘কসম’ (শপথ) ব্যবহার করা হয়। এখানে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কসম শব্দ ব্যবহার করে, অত্যন্ত জোরালোভাবে হারাম বর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন।

এটি জানা কথা যে, মাটি খাওয়া হয় না। নবীজীর এই হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, সামান্য হালাল ডাল-ভাত হলেও সেটাই গ্রহণ করো। হারাম থেকে বিরত থাকো।

বর্তমান সময়ে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদি অর্থনীতির সয়লাব। যার পুরোটাই হারাম দিয়ে ঢেলে সাজানো। অর্থনীতির প্রতিটি সেক্টরকে বেষ্টন করে আছে সুদ। এমন কঠিন পরিস্থিতিতে নবীজীর এই বাণী আমাদের ভাবতে শেখায়। আমাদেরকে থামতে বলে। হালাল হারামের তোয়াক্কা না করে যত্রতত্র অর্থের পেছনে ছুটতে বাধা দেয়। ‘হারাম খাওয়ার চেয়ে মাটি খাওয়া ভালো।’ হাদীসের এই অংশটি মনে রাখার মতো।

তাই আসুন, আমরা আমাদের উপার্জনে হালাল নিশ্চিত করি। আমাদের সন্তান, পরিবার-পরিজনের মুখে হালাল আহারের ব্যবস্থা করি। যেনো নবীজীর সেই বাণীর অন্তর্ভুক্ত না হতে হয়,

لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام.

‘সেই দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যা গঠিত হয়েছে হারাম দ্বারা।’ (মাজমাউয যাওয়ায়েদ ১০/৩৮০)

ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ: ইন্দোনেশিয়ার অভিজ্ঞতা ও বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবনা

মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম
কিমিয়া সা'দাত

সারসংক্ষেপ (Abstract)

প্রচলিত সুদভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ বা মাইক্রোফাইন্যান্স একটি ক্রমবর্ধমান খাত হিসেবে বিশ্বব্যাপী আবির্ভূত হয়েছে। বিশেষ করে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে, যেখানে ৭০ শতাংশের বেশি মানুষ এখনও আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত এবং প্রচলিত সুদী লেনদেনকে শরীয়াহবিরোধী মনে করেন। এই প্রবন্ধটি ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সের ধারণা, এর বিশ্বব্যাপী চিত্র এবং বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়ার সফল অভিজ্ঞতার ওপর আলোকপাত করে। ২০০৭ সালের CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) জরিপ অনুযায়ী, বৈশ্বিক মাইক্রোফাইন্যান্স খাতের মোট গ্রাহকের মাত্র ০.৫ শতাংশের কম অংশ ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সের আওতাভুক্ত ছিল, যা এই খাতের সীমিত পরিসর নির্দেশ করে। তবে, বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া ও আফগানিস্তানের মতো কয়েকটি দেশ এই সেবার প্রায় ৮০ শতাংশ সরবরাহ করে। প্রবন্ধটি ইন্দোনেশিয়ার Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) মডেলকে একটি সফল দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেছে, যা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (MSME) জন্য সুদমুক্ত ব্যাংকিং পরিষেবা প্রদান করে। এই মডেলটি ওয়াদিয়াহ (আমানত), মুদারাবা (লাভ-লোকসান অংশীদারিত্ব), মুরাবাহা (ক্রয়-বিক্রয়) এবং ইজারা (ভাড়া) এর মতো বিভিন্ন শরীয়াহ-সম্মত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই মডেলের একটি প্রস্তাবনা হিসেবে 'আল-ইছার মডেল' উপস্থাপন করা হয়েছে। এই মডেলে শূন্য সুদে 'ক্বরদ হাসান' (সুদমুক্ত ঋণ), অনুদান, তাকাফুল এবং সঞ্চয় ব্যবস্থার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। এই মডেলের মাধ্যমে সদস্যগণ দলবদ্ধভাবে ঋণ গ্রহণ করবেন এবং প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যয় নির্বাহের জন্য একটি বাস্তবিক সার্ভিস চার্জ প্রদান করবেন। এই প্রস্তাবিত মডেলটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে একটি টেকসই সমাধান হিসেবে কাজ করতে পারে।

মাইক্রো ফাইন্যান্স/ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

মাইক্রো ফাইন্যান্স হলো ক্ষুদ্র ফাইন্যান্স। সাধারণ অর্থে ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে যে ফাইন্যান্স প্রদান করা হয় তাকে মাইক্রো ফাইন্যান্স বলে। ব্যাপক অর্থে দেশের সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান ও সুবিধা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে তথা হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অর্থসংস্থানকারী প্রতিষ্ঠান এ সকল দরিদ্র জনসাধারণকে তাদের নিজেদের প্রয়োজনে সহজ শর্তে যে ক্ষুদ্র ফাইন্যান্স প্রদান করে তাকে মাইক্রো ফাইন্যান্স বলে।

জোয়ান লেজারউডের মতে, মাইক্রো ফাইন্যান্স বলতে বুঝায় স্বল্প আয়ের গ্রাহকদেরকে অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা, যা আত্মকর্মসংস্থানে সহায়তা করে। অর্থনৈতিক সেবার মধ্যে সঞ্চয় গড়ে তোলে এবং ঋণ প্রদান করে। (Microfinance refers to the provision of financial services to the low-income clients, including the self-employed. Financial services generally include saving and credit.) (Joanna 1999, 1, Joanna, Ledgerwood (1999), Microfinance Handbook : An Institutional and Financial Perspective, World Bank Press, p. 1).

ড. সালেহ উদ্দিন আহমদের মতে, মাইক্রো ফাইন্যান্স হচ্ছে বিস্তৃতভাবে সংজ্ঞায়িত এমন একটি কর্মসূচি, যা আত্মকর্মসংস্থান, অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মসূচি এবং ব্যবসায়িক কর্মসূচির জন্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ঋণ সরবরাহ করে।

(Ahmed 2003, 1, Ahmad, Dr. Saleh Uddin (2003), Micro Credit And Poverty : New Realities And Issues, Journal Of Bangladesh Studies, V-5, No-1, P. 1)

ড. মাহমুদ আহমদের মতে, মাইক্রোফাইন্যান্স বলতে বোঝায় ঐ ঋণ বা আর্থিক সেবা যা দরিদ্রকে বিশেষ শর্তাধীনে সহায়তা প্রদান করে। কেননা এসব দরিদ্র মানুষ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ পায় না। ক্ষুদ্র ঋণ, ক্ষুদ্র সঞ্চয়, ক্ষুদ্র বীমা ক্ষুদ্র ঋণের আর্থিক সেবার আওতায় পড়ে। এ সকল সেবা তারাই পাবেন যাদের আয় বৃদ্ধি করার জন্য আর্থিক সামর্থ্য নেই। (Ahmed 2010, 7)

ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স/ইসলামী ক্ষুদ্র বিনিয়োগ

ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স বলতে এমন ফাইন্যান্স বা আর্থিক সেবাকে বোঝায়, যা দরিদ্রদেরকে ইসলামী শরীয়াহর নীতিমালা অনুসরণ করে দেয়া হয়, যাতে সুদ বা ঘারার বর্জন করা হয় এবং তা আর্থিক সেবার সকল কার্যক্রমে সুদের লেনদেন ও সকল অনিশ্চয়তাকে বর্জন করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা থাকে। (Islam 2012, 65, Islam, Muhammad Nurul (July 2012), Micro finance & Islam, Zom Zom Publications, Dhaka, pp. 9-75)

ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স একটি মৌলিক ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ও অর্থায়ন প্রকল্প। যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখে। দারিদ্র বিমোচন, বেকারত্ব হ্রাসে ইসলামের ক্ষুদ্র বিনিয়োগ ও অর্থায়ন পদ্ধতি সবচেয়ে কার্যকরী। প্রচলিত সুদ ভিত্তিক মাইক্রোফাইন্যান্সের বিপরীতে ইসলামের মাইক্রোফাইন্যান্সে বহুমুখী সমাধান রয়েছে। প্রচলিত মাইক্রোফাইন্যান্সের মতো এটি নিছক ঋণ ভিত্তিক নয়।

Islamic microfinance মূলত এক সাথে দুটি বিষয় ধারণ করে-ক microfinance বা ক্ষুদ্র বিনিয়োগ/অর্থায়ন খ. Islamic finance/ইসলামী অর্থায়ন। অর্থাৎ মাইক্রোফাইন্যান্স হবে ইসলামী ফাইন্যান্স মোড ও নীতির আলোকে।

Islamic finance এর আলোকে ইসলামিক মাইক্রোফাইন্যান্স ইন্সটিটিউশন (IMFI)- সাধারণত দুটি ক্যাটাগরিতে বিভক্ত। যথা- ক. Revenue-based (অব্যবসায়িক ইসলামি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান)। খ. Profit-motive based (ব্যবসায়ী ইসলামী ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান।)

Revenue-based IMFI প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল লক্ষ্য লাভ নয়, বরং নিজ খরচ পূরণ করে টিকে থাকা (Break-even)। এ ধরনের IMFI এর শরীয়াহ মডেল হয়ে থাকে-শূন্য সুদ হার ক্বরদ/ঋণ। উক্ত ঋণের উৎস হয় ডোনেশন, কন্ট্রিবিউশন ও ক্যাশ ওয়াকফ। পাকিস্তানের Akhuwat মূলত এ ধরনের IMFI।

Profit-motive IMFI হল, সহনশীল লাভকেন্দ্রিক ইসলামি ক্ষুদ্র অর্থায়ন প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানগুলো মুনাফা করবে, তবে তা হবে সহনশীল। পুঁজিবাদের মতো লাগামহীন ও অসহনশীল নয়। এ ধরনের IMFI এর শরিআহ মডেল হয়ে থাকে-প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে। যথা-ক. বেচাকেনা ভিত্তিক মডেল। যেমন, মুরাবাহা। খ. ভাড়া ভিত্তিক মডেল। যেমন, ইজারা। গ. অংশীদারিত্ব ভিত্তিক মডেল। যেমন, মুদারাবা, মুশারাকা।

মানুষের মাঝে অনেকের আগ্রহ থাকে, কোনও পণ্য বা সম্পদ ক্রয় করা। যেমন, চাষাবাদের জন্য গরু ক্রয় করা। তার টাকা আছে। কিন্তু সে চায় সুলভ মূল্যে ভালো পণ্য পেতে। এসব ক্ষেত্রে তাদের সাথে সহনশীল প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে উক্ত মডেল প্রয়োগ করা যেতে পারে। সহনশীল হওয়ার অর্থ হবে তিনটি। যথা-

ক. মূল্য হবে সহনশীল। কিস্তিতে পরিশোধযোগ্য।
খ. পণ্য হবে কোয়ালিফাইড।
গ. প্রাসঙ্গিক পরামর্শ সেবা থাকবে।

বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান দারিদ্রদের জন্য এ ধরনের সহনশীল আর্থিক সেবা প্রদান করে থাকে। যেমন, বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক লি. এর আরডিএস (Rural Development Scheme) প্রডাক্ট এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

বিশ্বব্যাপী ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স

বিশ্বব্যাপী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে প্রায় ৭২ শতাংশ মানুষ এখনও আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত (Honohon, ২০০৭)। এসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক পরিসেবা থাকলেও অনেক মানুষ প্রচলিত সুদভিত্তিক পণ্যের সাথে লেনদেনকে ইসলামী শরীয়াহ বিরোধী মনে করেন। ফলে তারা ঐ সেবাগুলো গ্রহণ করতে আগ্রহী নন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কিছু মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান (MFIs) এই চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে মুসলিম নিম্নআয়ের মানুষের জন্য শরীয়াহসম্মত অর্থনৈতিক সেবা প্রদানে এগিয়ে এসেছে। এর

ফলে 'ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স' একটি নতুন বাজারধারার (market niche) রূপে আবির্ভূত হয়েছে, যা শরীয়াহভিত্তিক অর্থনীতির অঙ্গীকারে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে সম্প্রসারণ করছে। (Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche, bY CGAP, 1 August, 2008, BLOG, Focus note, no, 49, by Nimrah Karim, Michael Tarazi, and Xavier Reille)

ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স নিয়ে বিশ্বব্যাপী প্রথম জরিপ ও প্রতিবেদন

২০০৭ সালে CGAP (Consultative Group to Assist the Poor) ইসলামি মাইক্রোফাইন্যান্স নিয়ে প্রথমবারের মতো একটি বৈশ্বিক জরিপ পরিচালনা করে, যেখানে ১২৫টিরও বেশি প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং ১৯টি মুসলিম দেশের বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করা হয়। জরিপে প্রাপ্ত প্রধান ফলাফলসমূহ ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সের সীমিত বিস্তার ও কর্মক্ষমতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

এই জরিপ অনুযায়ী, বিশ্বের ১৪টি দেশে পরিচালিত ১২৬টি ইসলামি মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান প্রায় ৩ লক্ষ গ্রাহকের কাছে সেবা পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার কো-অপারেটিভ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অতিরিক্ত আনুমানিক ৮০,০০০ গ্রাহক সেবা পেয়েছে। বাংলাদেশ এই তালিকায় শীর্ষে রয়েছে, যেখানে ২টি সক্রিয় ইসলামি মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান প্রায় ১ লক্ষ গ্রাহককে সেবা দিচ্ছে। তবে একই সময় বাংলাদেশে প্রচলিত মাইক্রোফাইন্যান্সে প্রায় ৮০ লক্ষ ঋণগ্রহীতা থাকায়, ইসলামি মাইক্রোফাইন্যান্সের অংশ মাত্র ১ শতাংশ—যা এই খাতের সীমাবদ্ধ অবস্থানকে নির্দেশ করে। জরিপের ফলাফল ও অন্যান্য উৎসের বিশ্লেষণে দেখা যায়, সে সময় ইসলামি মাইক্রোফাইন্যান্সের বৈশ্বিক মোট গ্রাহক সংখ্যা ছিল আনুমানিক মাত্র ৩,৮০,০০০। যা বৈশ্বিক মাইক্রোফাইন্যান্স খাতের মোট আউটরিচের মাত্র ০.৫ শতাংশ বা তারও কম প্রতিনিধিত্ব করে। এই পরিসংখ্যান ইঙ্গিত করে যে, মুসলিম বিশ্বের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী শরীয়াহসম্মত আর্থিক সেবার বাইরে রয়ে গেছে এবং ইসলামি মাইক্রোফাইন্যান্স এখনো একটি নবীন ও সীমিত পরিসরের খাত হিসেবে অবস্থান করছে।

ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সের সরবরাহ বৈশ্বিকভাবে এখনও কয়েকটি নির্দিষ্ট দেশে কেন্দ্রীভূত। ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ ও আফগানিস্তান—এই তিনটি দেশ মিলে বিশ্বব্যাপী ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স সেবার প্রায় ৮০ শতাংশ জোগান দেয়। যদিও সরবরাহ সীমিত, তথাপি ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স পণ্যের চাহিদা বেশ দৃঢ়। উদাহরণস্বরূপ, জর্ডান, আলজেরিয়া এবং সিরিয়ায় পরিচালিত বিভিন্ন জরিপে দেখা গেছে, প্রচলিত সুদী মাইক্রোঋণ গ্রহণ না করার পেছনে ২০ থেকে ৪০ শতাংশ মানুষ ধর্মীয় কারণকে দায়ী করেছেন। এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, শরী'আহসম্মত আর্থিক পণ্যের প্রতি মুসলিম জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশের আস্থা ও আগ্রহ রয়েছে, যা ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সের বিস্তারের জন্য একটি শক্তিশালী ভিত্তি সৃষ্টি করে। (প্রাগুক্ত)

ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো—প্রচলিত মাইক্রোফাইন্যান্সের মতো এখানেও নারী গ্রাহকদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। CGAP-এর জরিপ অনুযায়ী, ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানের মোট গ্রাহকের গড়ে ৫৯ শতাংশই নারী, যা অনেক ক্ষেত্রে আরও বেশি—বাংলাদেশে এই হার ৯০ শতাংশ পর্যন্ত পৌঁছেছে।

২০০৭ সালের CGAP জরিপ অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সের জরিপে ১২৬টি প্রতিষ্ঠানকে অন্তর্ভুক্ত করে ১৫টি দেশের তথ্য দেয়া হয়েছিল। নিম্নে তা দেখানো হল-

Table 1. Outreach of Islamic Microfinance, by Country

Region	# of Included Institutions	% Female (Avg.)	Total # of Clients	Total Outstanding Loan Portfolio (US$)	Avg. Loan Balance (US$)
Afghanistan	4	22	53,011	10,347,29	162
Bahrain	1	n/a	323	96,565	299
Bangladesh	2	90	111,837	34,490,490	280
Indonesia*	105	60	74,698	122,480,000	1,640
Jordan	1	80	1,481	1,619,909	1,094
Lebanon	1	50	26,000	22,500,000	865
Mali	1	12	2,812	273,298	97
Pakistan	1	40	6,069	746,904	123
West Bank and Gaza**	1	100	132	145,485	1,102
Saudi Arabia	1	86	7,000	586,667	84
Somalia	1	n/a	50	35,200	704
Sudan	3	65	9,561	1,891,819	171
Syria	1	45	2,298	1,838,047	800
Yemen	3	58	7,031	840,240	146
TOTAL	126	59	302,303	197,891,882	541

* Micro and rural banks only.
**There were seven MFIs in the West Bank and Gaza that offered, with the help of training and funding facilities offered by the Islamic Development Bank, a total of 578 Islamic loans between 2005 and 2006. Data on only one of these seven are displayed in the table because the remaining six MFIs were disbursing Islamic loans with average loan sizes higher than 250 percent of the region's gross domestic product per capita.

(Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche, bY CGAP, 1 August, 2008, BLOG, Focus note, no, 49, by Nimrah Karim, Michael Tarazi, and Xavier Reille)

উক্ত টেবিলে দেখা যাচ্ছে-সারা বিশ্বে ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সের মোট গ্রাহক সংখ্যা (২০০৭ এর জরিপ অনুসারে) ৩,০২,৩০৩ জন। এর মাঝে মহিলা গ্রাহকের গড় হার: ৫৯%, যা প্রচলিত মাইক্রোফাইন্যান্সের তুলনায় প্রায়

সমান। সবচেয়ে বেশি ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান রয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় (১০৫টি) ও সর্বোচ্চ বকেয়া ঋণ (১২২ মিলিয়ন USD)।

CGAP জরিপে দেখা যায়, বিশ্বব্যাপী ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সে প্রদত্ত পণ্যের প্রায় ৭০ শতাংশই মুরাবাহা ভিত্তিক। অধিকাংশ ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান এক বা দুইটি শরীয়াহ-সম্মত পণ্য সরবরাহ করে, যার ফলে দারিদ্র্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর নানাবিধ আর্থিক চাহিদা পূরণে এই খাত এখনো প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য অর্জন করতে পারেনি।

ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠানের ধরন

বিশ্বব্যাপী ০৬ ধরনের প্রতিষ্ঠান ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স সেবা দিয়ে আসছে। যথা-

১. সমবায় প্রতিষ্ঠান (Cooperative)
২. এনজিও (Non-Governmental Organization)
৩. গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ দল (Village Bank)
৪. গ্রামীণ ব্যাংক (Rural Bank)
৫. অ-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান (NBFI-Non-Bank Financial Institutions)
৬. সনাতনী বাণিজ্যিক ব্যাংক (Commercial Banks)

উক্ত ০৬ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাঝে গ্রামীণ ব্যাংক সবচেয়ে বেশি ইসলামী ক্ষুদ্র ঋণের সেবা দিয়ে আসছে। ইন্দোনেশিয়ায় এ ধরনের প্রতিষ্ঠান-ই অধিক। নিম্নের টেবিলটি লক্ষণীয়-

Table 2. Outreach of Islamic Microfinance, by Institution Type

Institution Type	# of Institutions	Total # of Clients		Total Outstanding Loan Portfolio (Islamic)		Avg. Loan Size (Islamic)
		#	% of Total	US$	% of Total	US$
Cooperative	1	6,671	2	926,251	<1	132
Village Bank (Syria)	1	2,298	1	1,838,047	<1	800
NGO	14	125,793	42	41,421,580	21	303
Rural Bank (Indonesia)	105	74,698	25	122,475,158	62	1,640
NBFI	3	4,293	1	1,893,207	<1	595
Commercial Bank	2	87,569	29	29,030,997	15	305
TOTAL	126	305,237	100	198,090,268	100	629

Note: This table reflects the data of only those institutions (mixed and fully Islamic) that provided reliable outreach information to CGAP during its 2007 global survey of Islamic microfinance. Data regarding the 105 rural banks in Indonesia were obtained from the Indonesian Central Bank's 2007 Statistics. This table excludes data on the outreach of Indonesia's 4,500 cooperatives. As in the rest of this Focus Note, an MFI is defined as an institution targeting the poor and whose average loan size is less than 250 percent of the country's gross domestic product per capita.

(Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche, bY CGAP, 1 August, 2008, BLOG, Focus note, no, 49, by Nimrah Karim, Michael Tarazi, and Xavier Reille)

উল্লেখ্য, Rural Bank ও Village Bank—দুটি শব্দ দেখতে কাছাকাছি হলেও, এগুলোর কাঠামো, নিয়ন্ত্রণ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে বেশ পার্থক্য রয়েছে। Rural Bank হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা সরকারের অধীনে নিবন্ধিত একটি ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান, যা মূলত গ্রামীণ অঞ্চলের কৃষক, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও নিম্নআয়ের মানুষদের ঋণ ও সঞ্চয় সেবা প্রদান করে। অপরদিকে Village Bank হলো গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব উদ্যোগে গঠিত একটি সামাজিক ঋণ ও সঞ্চয় প্রতিষ্ঠান, যা সাধারণত NGO বা উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় পরিচালিত হয়। এটি আইনগতভাবে ব্যাংক না হলেও, ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম চালায়। ভিলেজ ব্যাংক বা গ্রামীণ ব্যাংক দ্বারা এখানে ড.ইউনুসের সুদী গ্রামীণ ব্যাংক উদ্দেশ্য নয়।

ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স: বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা

ইন্দোনেশিয়া

আধুনিক কালে ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সের প্রথম প্রয়াস হয়েছিল মিশরে। তবে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়েছে এর মাইক্রো বিজনেসের বিশাল সংখ্যার মাধ্যমে। ইন্দোনেশিয়ায় বিদ্যমান ৫৩.৮ মিলিয়ন ব্যবসার মধ্যে প্রায় ৯৮.৮৫%-ই মাইক্রো বিজনেস; বাকি ব্যবসাগুলোর মধ্যে ১.১৪% ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান (SMEs), এবং মাত্র ০.০১% বড় করপোরেশন।

মাইক্রোবিজনেসের এই বিস্তার ইন্দোনেশিয়ায় অনেক পুরোনো একটি বাস্তবতা। ফলে এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যিক মাইক্রোফাইন্যান্স ব্যবস্থার বিকাশকারী প্রথম দেশগুলোর একটি হলো ইন্দোনেশিয়া। এখানকার নিয়ন্ত্রিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জজুড়ে মাইক্রোফাইন্যান্স সেবা দিয়ে আসছে।

ইন্দোনেশিয়ার মাইক্রোফাইন্যান্স খাতে আনুমানিক ৭,০০০টি ফরমাল এবং ৫০,০০০টি সেমি-ফরমাল নিবন্ধিত ইউনিট রয়েছে, যেগুলো ৫.৫ কোটি আমানতকারী এবং ৩.৪ কোটি ঋণগ্রহীতা-কে সেবা দিচ্ছে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ বা আধা-নগর এলাকায় অবস্থিত।

দেশটিতে মাইক্রোবিজনেসের সংখ্যা অনেক, এদের সম্মিলিত অবদান ইন্দোনেশিয়ার মোট জিডিপির মাত্র ৩৪%—প্রায় ২২৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অন্যদিকে ৬ লাখ ছোট ও মাঝারি প্রতিষ্ঠান জিডিপির ২৩% অবদান রাখছে। অবশিষ্ট ৪৩% জিডিপি তৈরি করছে মাত্র ৪,৮০০টি বড় কর্পোরেশন।

ইন্দোনেশিয়ার মাইক্রোফাইন্যান্স উদ্যোগগুলো দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭০-এর দশকে যেখানে দারিদ্র্য হার ছিল ৪০%, তা ২০১১ সালে কমে ১২.৪%-এ নেমে আসে। এই সাফল্যের পেছনে রয়েছে ১৯৮০ সালের

পর চালু হওয়া জাতীয় উন্নয়ন কৌশল, যার মধ্যে ১৯৯৪ সালে মাইক্রোফাইন্যান্সকে একটি প্রধান কৌশল হিসেবে স্থান দেওয়া হয়।

দেশটিতে বিকশিত মাইক্রোফাইন্যান্সে ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স শীর্ষে। ফলশ্রুতিতে দেশটি ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স বিকাশে অন্যতম রোল মডেল দেশ হিসেবে বিবেচিত। দেশটির সরকার এই খাতের উন্নয়নে সক্রিয় ও দূরদর্শী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২০০২ সালে 'Bank Indonesia' একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিল "Blueprint of Islamic Banking Development in Indonesia"। এই পরিকল্পনার আওতায় নয় বছরের একটি রোডম্যাপ নির্ধারণ করা হয়, যার অংশ হিসেবে ১০৫টি শরীয়াহভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাংকের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিগত পাঁচ বছরে সরকার ৩৫টি নতুন ইসলামী গ্রামীণ ব্যাংকের (Sharia rural banks.) লাইসেন্স প্রদান করেছে, যা একটি সহায়ক নিয়ন্ত্রক কাঠামো গঠনের প্রতিফলন।

এছাড়াও, ইসলামী আর্থিক খাতের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে Bank Indonesia নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছে। তারা মেদান শহরে একটি প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান কেন্দ্র স্থাপন করেছে, যেখানে শরীয়াহভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাংকের কর্মকর্তা, ব্যবস্থাপক ও পরিচালকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ, কারিগরি জ্ঞান ও সার্টিফিকেশন প্রদান করা হয়। এসব পদক্ষেপ ইঙ্গিত করে যে, ইন্দোনেশিয়ার সরকার ইসলামী অর্থনীতিকে শুধু মতাদর্শিক নয়, বরং বাস্তব অর্থনৈতিক বিকাশের হাতিয়ার হিসেবে দেখছে।

ইন্দোনেশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক (Bank Indonesia) এর তথ্য অনুযায়ী, ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স বর্তমানে দেশের মোট ইসলামী অর্থায়নের ৭০%-এর বেশি জুড়ে রয়েছে। একইসাথে, কেন্দ্রীয় ব্যাংক পূর্বাভাস দিয়েছে যে, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রতিষ্ঠানে ইসলামী অর্থায়নের মোট পরিমাণ ২০২৫ সালের মধ্যে ৫.১ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে।

বিপিআর ও বিপিআরএস

ইন্দোনেশিয়ার মাইক্রো বিজনেসে সুদী মাইক্রো গ্রামীণ ব্যাংক যেমন আছে, তেমনি ইসলামী মাইক্রো গ্রামীণ ব্যাংকও আছে। এখানে প্রচলিত সুদী মাইক্রো বিজনেস ব্যাংকগুলো Bank Perkreditan Rakyat (BPR) নামে এবং ইসলামী মাইক্রো বিজনেস ব্যাংকগুলো Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) নামে পরিচিত।

এই BPRS ব্যাংকগুলো ব্যক্তিমালিকানাধীন হলেও, তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক Bank Indonesia কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও তত্ত্বাবধায়ক। তাদের কার্যক্রম জেলার মধ্যে সীমিত; তারা শুধুমাত্র ঋণ ও সঞ্চয় সেবা দিতে পারে, তবে পেমেন্ট বা লেনদেন সেবা (যেমন: মানি ট্রান্সফার, বিল পেমেন্ট) দিতে পারে না।

২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইন্দোনেশিয়ায় মোট ১,৮৮০টি প্রচলিত গ্রামীণ ব্যাংক (BPR) এবং ১০৫টি ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাংক (BPRS) সক্রিয় ছিল। এই দ্বৈতব্যবস্থার মাধ্যমে ইন্দোনেশিয়া ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স খাতকে সুসংগঠিত কাঠামোর আওতায় পরিচালিত করছে, যা মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য দেশগুলোর জন্য একটি পথনির্দেশক হতে পারে।

ইন্দোনেশিয়ার Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) বা শরীয়াহভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাংকগুলো শুধুমাত্র শরীয়াহসম্মত নয়, বরং সামাজিক দায়িত্বে অনেক বেশি অগ্রগামী। এদের মিশন স্টেটমেন্টে সুস্পষ্টভাবে বলা আছে—তারা সমাজের কল্যাণে, বিশেষ করে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের (microentrepreneurs) সহযোগিতায় কাজ করে।

এই ব্যাংকগুলো ইন্দোনেশিয়ার প্রভাবশালী মুসলিম সামাজিক আন্দোলন যেমন নাহদাতুল উলামা (Nahdatul Ulama) ও মুহাম্মদিয়া (Muhammadiyah)-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখে, যা তাদের সামাজিক ভিত্তিকে আরও শক্তিশালী করে। প্রতিটি BPRS-এ একটি শরীয়াহ বোর্ড রয়েছে, যারা ব্যাংকের প্রোডাক্ট ও লেনদেনের শরীয়াহ সম্মততা যাচাই করে থাকে। তবে একটি চ্যালেঞ্জ হলো—এই বোর্ডগুলোর রায় ও দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় একরকম নয়, ফলে একেকটি BPRS ভিন্ন ভিন্ন ইসলামী পণ্য বা চুক্তির কাঠামো ব্যবহার করে। এর ফলে একই দেশের মধ্যেই ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স পণ্যের বৈচিত্র্য দেখা যায়।

BPRS মডেল: একটি বিস্তারিত বিশ্লেষণ

ইন্দোনেশিয়ার Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) বা ইসলামী গ্রামীণ ব্যাংক হলো দেশটির আর্থিক অন্তর্ভুক্তির একটি সফল উদাহরণ। এটি প্রচলিত সুদভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাংক (BPR) এর শরিয়াহসম্মত বিকল্প হিসেবে কাজ করে এবং এর মূল লক্ষ্য হলো গ্রামীণ এলাকার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা,

কৃষক এবং নিম্ন-আয়ের মানুষদের কাছে সুদমুক্ত ব্যাংকিং পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া।

BPRS এর মূল উদ্দেশ্য ও দর্শন

BPRS শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান নয়, এর একটি শক্তিশালী সামাজিক দায়বদ্ধতাও রয়েছে। এর প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

এক. রিবা (সুদ) বর্জন: সুদভিত্তিক লেনদেন থেকে সমাজকে মুক্ত করে শরিয়াহর আলোকে আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

দুই. ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের (MSME) ক্ষমতায়ন: যারা প্রচলিত ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ পান না, তাদের পুঁজির যোগান দেওয়া।

তিন. গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়ন: স্থানীয় পর্যায়ে সঞ্চয় সংগ্রহ এবং বিনিয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতির ভিত শক্তিশালী করা।

চার. আর্থিক অন্তর্ভুক্তি: ব্যাংকিং সেবার বাইরে থাকা বিশাল জনগোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক আর্থিক কাঠামোর আওতায় আনা।

BPRS এর কার্যকারী মডেল

BPRS এর মডেলটি দুটি প্রধান স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে: তহবিল সংগ্রহ (Amanah) এবং তহবিল বিনিয়োগ (Financing)।

১. তহবিল সংগ্রহ (সঞ্চয় ও আমানত গ্রহণ)

BPRS গ্রাহকদের কাছ থেকে মূলত দুটি শরিয়াহ-সম্মত পদ্ধতিতে সঞ্চয় ও আমানত গ্রহণ করে:

• ওয়াদিয়াহ (Wadiah - আমানত/Safekeeping):

কার্যপদ্ধতি: গ্রাহক তার অর্থ BPRS-এ চলতি বা সঞ্চয়ী অ্যাকাউন্টে জমা রাখেন। ব্যাংক এই অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে এবং গ্রাহক যেকোনো সময় তা তুলতে পারেন।

মুনাফা: এই চুক্তিতে ব্যাংক গ্রাহককে কোনো নির্দিষ্ট মুনাফা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় না। তবে, ব্যাংক স্বেচ্ছায় খুশি হয়ে জমাকৃত অর্থের উপর গ্রাহককে কিছু 'হিবা' (উপহার) দিতে পারে। এটি ব্যাংকের লাভজনক বিনিয়োগের উপর নির্ভরশীল।

প্রয়োগ: এটি সাধারণ সেভিংস অ্যাকাউন্টের মতো কাজ করে।

• মুদারাবা (Mudarabah - লাভ-লোকসান অংশীদারি):

কার্যপদ্ধতি: এই চুক্তিতে গ্রাহক (যিনি সাহিব-আল-মাল বা পুঁজির মালিক) তার অর্থ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ব্যাংকের কাছে জমা রাখেন। ব্যাংক (যিনি মুদারিব বা তহবিল ব্যবস্থাপক) সেই অর্থ বিভিন্ন হালাল ব্যবসায় বিনিয়োগ করে।

মুনাফা: অর্জিত লাভ পূর্বনির্ধারিত একটি অনুপাতে (যেমন, ৭০:৩০ বা ৬০:৪০) ব্যাংক এবং গ্রাহকের মধ্যে ভাগ করা হয়। যদি লোকসান হয়, তবে আর্থিক লোকসান গ্রাহক বহন করেন এবং ব্যাংক তার শ্রম হারায়।

প্রয়োগ: এটি মূলত ফিক্সড ডিপোজিট বা মেয়াদী আমানতের ইসলামি বিকল্প।

২. তহবিল বিনিয়োগ (অর্থায়ন বা ফাইন্যান্সিং)

BPRS সরাসরি নগদ টাকা ঋণ হিসেবে না দিয়ে, বিভিন্ন শরিয়াহ-সম্মত চুক্তির মাধ্যমে গ্রাহকদের অর্থায়ন করে থাকে। সবচেয়ে জনপ্রিয় কয়েকটি মডেল হলো:

• মুরাবাহা (Murabahah - ক্রয়-বিক্রয়ভিত্তিক অর্থায়ন):

কার্যপদ্ধতি: এটি BPRS-এর সবচেয়ে বহুল ব্যবহৃত পদ্ধতি। যখন কোনো গ্রাহকের কোনো পণ্য (যেমন: মেশিন, মোটরসাইকেল, সার) কেনার প্রয়োজন হয়, তখন:

(১) গ্রাহক BPRS-কে পণ্যটি কেনার জন্য অনুরোধ করেন।

(২) BPRS বিক্রেতার কাছ থেকে পণ্যটি নগদে কিনে নিজের মালিকানায় নিয়ে আসে।

(৩) এরপর ব্যাংক পণ্যের ক্রয়মূল্যের সাথে নিজেদের একটি নির্দিষ্ট লাভ যোগ করে গ্রাহকের কাছে বাকিতে (কিস্তিতে) বিক্রি করে।

(৪) উদাহরণ: একজন কৃষক একটি ট্রাক্টর কিনতে চাইলে BPRS প্রথমে ট্রাক্টরটি কিনে নেয় এবং তারপর লাভ যোগ করে কৃষকের কাছে মাসিক কিস্তিতে বিক্রি করে।

• মুশারাকা (Musharakah - অংশীদারিভিত্তিক অর্থায়ন):

কার্যপদ্ধতি: কোনো ব্যবসায় ব্যাংক এবং গ্রাহক উভয়েই নির্ধারিত অনুপাতে মূলধন বিনিয়োগ করে। অর্জিত লাভ মূলধন অনুপাতে ভাগ করা হয় এবং লোকসানও মূলধন অনুপাতে বহন করতে হয়।

উদাহরণ: একজন সবজি বিক্রেতা তার ব্যবসা বড় করতে চাইলে, BPRS এবং বিক্রেতা উভয়েই টাকা দিয়ে ব্যবসা শুরু করতে পারে। লাভের একটি অংশ উভয়েই পায়।

• ইজারা (Ijarah - ভাড়াভিত্তিক অর্থায়ন):

কার্যপদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে ব্যাংক গ্রাহকের প্রয়োজনীয় কোনো সম্পদ (যেমন: গাড়ি, যন্ত্রপাতি) কিনে তা গ্রাহককে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ভাড়া দেয়। মেয়াদ শেষে গ্রাহক চাইলে সম্পদটি কিনেও নিতে পারেন (একে "ইজারা ওয়া ইক্বতিনা" বলা হয়)।

উদাহরণ: একজন চালক গাড়ি ভাড়ায় চালাতে চাইলে, BPRS গাড়িটি কিনে চালককে মাসিক ভাড়ায় ব্যবহারের সুযোগ দেয়।

• কর্জ হাসান (Qard Hasan - সুদমুক্ত ঋণ):

কার্যপদ্ধতি: এটি কোনো লাভ ছাড়াই শুধুমাত্র মানবিক কারণে প্রদত্ত ঋণ। সাধারণত খুব ছোট অংকের এবং জরুরি প্রয়োজন (যেমন: শিক্ষা, চিকিৎসা) মেটাতে এই ঋণ দেওয়া হয়। গ্রাহক শুধুমাত্র ঋণের আসল অর্থ ফেরত দিতে বাধ্য থাকেন। সাথে নামমাত্র বাস্তবিক সার্ভিস চার্জ।

প্রচলিত গ্রামীণ ব্যাংক (BPR) বনাম ইসলামী গ্রামীণ ব্যাংক (BPRS)

বৈশিষ্ট্য	BPR (প্রচলিত গ্রামীণ ব্যাংক)	BPRS (ইসলামী গ্রামীণ ব্যাংক)
মূল ভিত্তি	সুদ (Interest)	লাভ-লোকসানের অংশীদারি ও বাণিজ্য
সম্পর্ক	ঋণদাতা ও ঋণগ্রহীতা (Creditor-Debtor)	অংশীদার, বিক্রেতা-ক্রেতা, ভাড়াটিয়া-মালিক
আয়	ঋণের উপর নির্দিষ্ট হারের সুদ	ব্যবসার লাভ, ভাড়া বা সার্ভিস চার্জ
ঝুঁকি	ঋণের ঝুঁকি সম্পূর্ণ গ্রাহকের উপর বর্তায়	ঝুঁকি চুক্তি অনুযায়ী ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়েই বহন করে
তত্ত্বাবধান	শুধুমাত্র আর্থিক তত্ত্বাবধান করা হয়	আর্থিক দিকের পাশাপাশি ব্যবসাটি শরিয়াহসম্মত কি না তাও নিশ্চিত করা হয়।
সামাজিক ভূমিকা	মূলত বাণিজ্যিক, সামাজিক ভূমিকা সীমিত	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যের পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় উন্নয়ন একটি প্রধান লক্ষ্য।

(নিজস্ব রচিত)

মোটকথা,

ইন্দোনেশিয়ার BPRS মডেলটি শরিয়াহভিত্তিক ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের এক সফল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। এটি নিছক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান নয়; বরং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়ন, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠন এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তির এক কার্যকর সমন্বয়। মডেলটি কেবল দারিদ্র্য হ্রাসে ভূমিকা রাখছে না, একইসাথে ক্ষুদ্র ব্যবসার বিকাশ ও জিডিপি প্রবৃদ্ধিতেও সরাসরি অবদান রাখছে।

এর বাস্তব প্রমাণ মেলে তাদের কার্যক্রমের দক্ষতায়। স্থানীয় পর্যায়ে সঞ্চয় আহরণে এর সাফল্য এবং ১১০ শতাংশের বেশি Loan-to-Deposit Ratio (LDR) এটাই নির্দেশ করে যে, প্রতিষ্ঠানটি সংগৃহীত আমানতকে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিনিয়োগে রূপান্তর করে স্থানীয় অর্থনীতিকে সক্রিয়ভাবে শক্তিশালী করছে।

সুতরাং, BPRS কেবল একটি ইসলামী গ্রামীন ব্যাংক নয়, এটি একটি টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের কার্যকর হাতিয়ার।

বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স মডেল

বিভিন্ন দেশের কেইস স্টাডির আলোকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা সামনে রেখে নিম্নোক্ত ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্স মডেল প্রস্তাব করা যেতে পারে-

'আল-ইছার মডেল'

'আল-ইছার' মানে হল-অপরের সুবিধা ও কল্যাণকে নিজের উপর প্রাধান্য দেয়া। উক্ত মডেলে মূলত ক্বরদ, স্বেচ্ছা অনুদান ও তাকাফুল-তিনের মিশ্রণে 'আল-ইছার' সৃষ্টি হবে। যেমনটি মালয়েশিয়ার আমানাহ ইখতিয়ার ফাউন্ডেশনে হয়ে থাকে।

• ক্বরদ হাসান দেওয়া হবে – নিজের পুঁজি দিয়ে অপরকে সাহায্য।

• অনুদান গ্রহণ করা হবে – যার মাধ্যমে কল্যাণ তহবিল গঠিত হবে।

• তাকাফুল ব্যবস্থায় একে অপরের ঝুঁকি ভাগ করে নেওয়া হবে।

উক্ত মডেলে শূন্য সুদে ক্বরদ দেয়া হবে। উক্ত অনুমোদিত ঋণ থেকে প্রথমেই গ্রাহকের অনুমোদন ক্রমে অনুদানের অংশ ও তাকাফুল কন্ট্রিবিউশন কেটে রাখা হবে। গ্রাহক পরবর্তীতে কেবল অনুমোদিত ঋণ ও বাস্তবিক সার্ভিস চার্জ আদায় করবে। কোনও প্রকার সুদ আদায় করবে না।

তহবিল যোগান: তহবিলের যোগান দেয়া হবে-সরকার ও বেসরকারী অনুদান থেকে। তবে গ্রাহক/সদস্যদের দানে গড়ে উঠা অনুদান তহবিল থেকে নয়। পাশাপাশি ক্যাশ ওয়াকফ হবে অন্যতম তহবিল যোগানদাতা। ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে। স্থায়ী ও অস্থায়ী ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট থাকবে। আগ্রহীগণ তাতে ক্যাশ ওয়াকফ করবেন।

ঝুঁকি নিরসন কৌশল: ঝুঁকি নিরসনের জন্য মৌলিকভাবে নিম্নোক্ত চারটি পদ্ধতি অবলম্বন করা হবে। যথা-

১. স্যোশাল প্রেশার। গ্রুপ ভিত্তিক ঋণ বিতরণ করা হবে। এককভাবে নয়।

২. গ্যারান্টর নিয়োগ দেয়া। প্রতি গ্রুপ বা দলের প্রত্যেকে অপরের জন্য কাফিল বা গ্যারান্টর হবেন।

৩. তাকাফুলে অংশগ্রহণ।

৪. সঞ্চয়। অর্থাৎ সদস্য হতে হবে। সদস্য হয়ে সঞ্চয় করতে হবে। তবে সঞ্চয় করলেই ঋণ নিতে হবে-এমনটি জরুরী নয়।

পৃথক পৃথক তহবিল গঠন ও তহবিল সমূহের আয়, ব্যয়, পরিচালন পদ্ধতি

'আল-ইছার' মডেলে সদস্যদের মোট চারটি তহবিল গঠন হবে। যথা-

ক. অনুদান তহবিল। এর আয় উৎস, ঋণ গ্রহীতা সদস্যদের অনুদান। ব্যয় খাত: সদস্যদের বিপদে ব্যয় হবে। এটিই এর মূল ব্যয় খাত হিসাবে বিবেচিত হবে। ঋণ আদায় না করে কেউ মারা গেলে, ত্যক্ত সম্পদ ঋণ আদায় ব্যর্থ হলে, ওয়ারিশদেরকে অনুদান তহবিল থেকে সহায়তা দেয়া হবে। যেনো তারা ঋণ আদায় করতে পারেন। সরাসরি তহবিল থেকে ঋণ উসূল করা যাবে না। উক্ত তহবিল থেকে কাউকে ঋণ দেয়া হলে, সেটির কোনও প্রকার সার্ভিস চার্জ কর্তন করা যাবে না। উক্ত তহবিল বিনিয়োগ করা হবে। প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগকারী হিসাবে (মুদারিব) কেবল নির্ধারিত হারে মুনাফা পাবেন। কোনও প্রকার ওয়াকালা ফি নয়।

খ. তাকাফুল তহবিল। এটি হবে সাধারণ তাকাফুল। তাই এতে প্রদেয় কন্ট্রিবিউশন তাকাফুল নীতি অনুসারে মূলত দুটি ভাগে বিভক্ত হবে। যথা-ক.তাবাররু। খ. ওয়াকালাহ।

যারা ঋণ আদায়ে অক্ষম হবে, তাদের ঋণের অংশ বিশেষ উক্ত তহবিল থেকে আদায় করা হবে। কখন, কিভাবে কাউকে অক্ষম বলা হবে, এর জন্য নীতিমালা প্রণয়ণ করতে হবে।

প্রকাশ থাকে যে, পূর্বোক্ত অনুদান তহবিল থেকে ঋণ আদায় করতে হলে, সেটি সরাসরি আদায় করা যাবে না। মৃতের ওয়ারিশকে তা প্রথমে অনুদান হিসাবে দিতে হবে। এরপর সে তা দিয়ে ঋণ আদায় করতে পারে। কিন্তু উক্ত তাকাফুল তহবিল থেকে সরাসরি অক্ষমদের বকেয়া ঋণ উসূল করা যাবে।

উক্ত তহবিল বিনিয়োগ করা যাবে। বিনিয়োগ করে মুদারিব হিসাবে প্রতিষ্ঠান মুদারাবা মুনাফা লাভ করবে।

গ.পরিচালন তহবিল: এ তহবিলের আয় উৎস হবে-ক্বরদ এর বাস্তবিক সার্ভিস চার্জ, তাকাফুল তহবিল পরিচালন বাবদ ওয়াকালাহ ফি, তাকাফুল তহবিল বিনিয়োগে মুদারিব হিসাবে প্রাপ্ত মুনাফা। ক্যাশ ওয়াকফ তহবিল পরিচালন বাবদ ম্যানেজম্যান্ট ফি। পাশাপাশি তা বিনিয়োগ হলে সেখান থেকেও মুদারাবার মুনাফার একটি হার প্রাপ্য হবে। এছাড়া সদস্যদের সঞ্চয়কৃত অর্থ মুদারাবায় বিনিয়োগ করে সেখান থেকেও মুদারিব হিসাবে মুনাফার একটি হার প্রাপ্য হবে। উক্ত বিনিয়োগ কার্যক্রমের অধীনে প্রতিষ্ঠান সরাসরি বেচাকেনাও করতে পারবে। যা ইসলামী মাইক্রো ফাইন্যান্সের বিনিয়োগ ভিত্তিক মডেল হিসাবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের ইসলামী ব্যাংক লি. এর আরডিএস এর মতো।

ঘ. ক্যাশ ওয়াকফ তহবলি: প্রতিষ্ঠানের অর্থ যোগানের এটি হল গুরুত্বপূর্ণ উৎস। উক্ত তহবিল থেকেই মূলত শূন্য সুদ হারে ঋণ প্রদানের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। ছোট বড় নানা এমাউন্টের ক্যাশ ওয়াকফ সার্টিফিকেট প্রডাক্ট ইস্যু করা হবে। স্থায়ী, অস্থায়ী দু'ধরনের সুযোগ থাকবে। কেউ চাইলে ৬ মাসের জন্যও ৫ হাজার টাকা ক্যাশ ওয়াকফ করতে পারবেন। ৬ মাস পর তার টাকা তিনি তুলে নিতে পারবেন। আবার কেউ চাইলে স্থায়ীভাবে ক্যাশ ওয়াকফ করতে পারবেন। উক্ত

তহবিল সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য স্বতন্ত্র নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।

নিম্নে একটি ফ্লো চার্টে পুরো মডেলটি উত্থাপন করা হল-

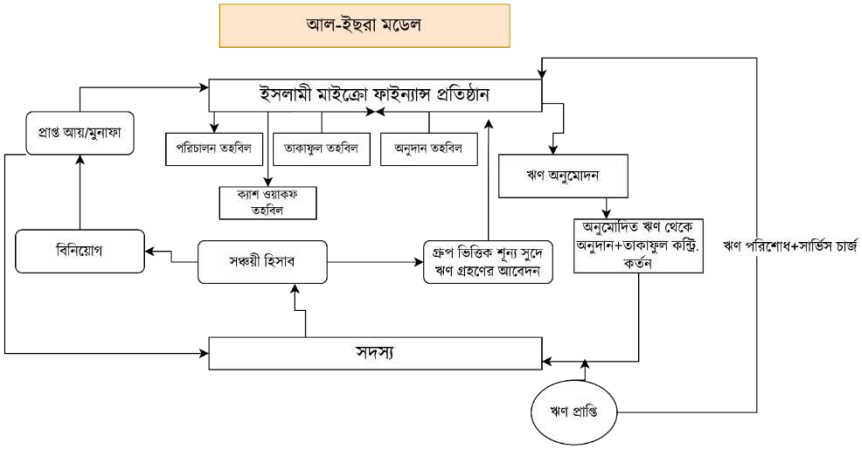

(নিজস্ব রচিত)

ফ্লো চার্টের ব্যাখ্যা-

১. ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান ও তার তহবিলসমূহ

ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স প্রতিষ্ঠান: এটি মডেলের কেন্দ্রবিন্দু, যা সকল আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে।

তহবিলসমূহ (Funds): প্রতিষ্ঠানটি মূলত চারটি প্রধান তহবিলের উপর ভিত্তি করে পরিচালিত হয়:

পরিচালন তহবিল: প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যক্রম, প্রশাসনিক খরচ এবং কর্মীদের বেতন ভাতা ইত্যাদি নির্বাহের জন্য এই তহবিল ব্যবহৃত হয়। সদস্যরা ঋণ পরিশোধের সময় যে সার্ভিস চার্জ দেন, তা এই তহবিলে জমা হয়। এছাড়া ওয়াকালাহ ফি ও বিভিন্ন মুদারাবা মুনাফাও জমা হয়।

তাকাফুল তহবিল: এটি একটি ইসলামী বীমা তহবিল। ঋণগ্রহীতা সদস্যের মৃত্যু, অসুস্থতা বা অন্য কোনো দুর্ঘটনাজনিত কারণে ঋণ পরিশোধে অক্ষম হলে এই তহবিল থেকে সহায়তা প্রদান করা হয়। ঋণ অনুমোদনের পর সামান্য পরিমাণ অর্থ কেটে এই তহবিলে রাখা হয়।

অনুদান তহবিল: বিভিন্ন ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে প্রাপ্ত দান বা অনুদান এই তহবিলে জমা হয়। এটি সদস্যদের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়।

ক্যাশ ওয়াকফ তহবিল: সাধারণ ওয়াকিফদের প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা এই স্থায়ী ও জনকল্যাণমূলক তহবিলটি গঠিত হয়। এই তহবিল সরাসরি ক্বরদ প্রদানে ব্যয় হয়। বিনিয়োগও হয়।

অর্জিত মুনাফার একটি অংশ প্রতিষ্ঠানের পরিচালন তহবিলে 'মুদারিব' হিসাবে যোগ হয়, যা প্রতিষ্ঠানকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে।

২. সদস্য ও ঋণ গ্রহণ প্রক্রিয়া

সদস্য: যে কোনো ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের 'সদস্য' হয়ে একটি 'সঞ্চয়ী হিসাব' খুলতে পারেন। এটি বিনিয়োগ হয়ে মুনাফা যুক্ত হয়।

ঋণের আবেদন: সদস্যগণ দলবদ্ধভাবে শূন্য সুদে 'ঋণ গ্রহণের জন্য আবেদন' করেন। গ্রুপ বা দলভিত্তিক হওয়ায় ঋণের ঝুঁকি কমে আসে।

ঋণ অনুমোদন ও কর্তন: প্রতিষ্ঠান আবেদন যাচাই করে 'ঋণ অনুমোদন' করে। এরপর অনুমোদিত ঋণের অর্থ থেকে 'অনুদান' ও 'তাকাফুল' তহবিলের জন্য নির্ধারিত অংশ কর্তন করা হয়।

ঋণ প্রাপ্তি ও বিনিয়োগ: কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ সদস্য 'ঋণ হিসেবে প্রাপ্ত' হন এবং সেই অর্থ আয়বর্ধক কোনো কাজে 'বিনিয়োগ' করেন।

৩. আয় ও ঋণ পরিশোধ

প্রাপ্ত আয়/মুনাফা: বিনিয়োগ থেকে সদস্যের আয় বা মুনাফা অর্জিত হয়।

ঋণ পরিশোধ + সার্ভিস চার্জ: সদস্য তার অর্জিত আয় থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণের কিস্তি পরিশোধ করেন। ঋণের অর্থের পাশাপাশি একটি বাস্তবিক 'সার্ভিস চার্জ' প্রদান করেন, যা প্রতিষ্ঠানের পরিচালন খরচ নির্বাহে সাহায্য করে। এটি সুদ নয়, বরং সেবার বিনিময় মূল্য।

এই চক্রাকার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আল-ইছরা মডেলটি সদস্যদের আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিকভাবেও টেকসই থাকে।

উপসংহার

প্রচলিত মাইক্রোফাইন্যান্সের বিপরীতে ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স কেবল আর্থিক সেবা নয়, বরং এটি একটি নৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতাসম্পন্ন ব্যবস্থা। প্রচলিত মাইক্রোফাইন্যান্স নিছক ঋণভিত্তিক হলেও, ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্সে মুরাবাহা, ইজারা, মুদারাবা ও মুশারাকার মতো বহুমুখী সমাধান রয়েছে, যা কেবল মুনাফাকেন্দ্রিক নয় বরং ঝুঁকি ভাগাভাগি এবং ন্যায়ভিত্তিক নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত।

BPRS মডেল একটি সফল ও অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এটি শুধু আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতেই ভূমিকা রাখেনি, বরং স্থানীয় পর্যায়ে সঞ্চয় আহরণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসার বিকাশেও সরাসরি অবদান রেখেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত এবং সামাজিক আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই মডেলটি প্রমাণ করে যে, একটি সুসংগঠিত কাঠামো থাকলে ইসলামী মাইক্রোফাইন্যান্স দারিদ্র্য হ্রাসের একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে।

এই অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের জন্য প্রস্তাবিত 'আল-ইছার মডেল' একটি সময়োপযোগী ও উদ্ভাবনী সমাধান হতে পারে। এই মডেলটি ক্বরদ, অনুদান, তাকাফুল ও সঞ্চয়ের সমন্বয়ে গঠিত, যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য একটি টেকসই আর্থিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পারে। এটি কেবল ঋণ প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ঝুঁকি নিরসনের একটি পদ্ধতিও বটে। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে প্রচলিত মাইক্রোফাইন্যান্সের গ্রাহক সংখ্যা ৮০ লক্ষেরও বেশি , সেখানে এই মডেলের বাস্তবায়ন ইসলামী ব্যাংকিং খাতের প্রসার ঘটাতে এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ফলশ্রুতিতে, এই মডেলটি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে আশা করা যায়।

গ্রন্থপঞ্জি (Bibliography) :

• Ahmed, Dr. Saleh Uddin (2003). Micro Credit And Poverty : New Realities And Issues. Journal Of Bangladesh Studies, V-5, No-1, P. 1.

• Ahmed, Dr. Mahmud (2010). Microfinance. (P. 7).

• CGAP (2008). Islamic Microfinance: An Emerging Market Niche. (Nimrah Karim, Michael Tarazi, and Xavier Reille).

• Honohon, P. (2007). Microfinance and Islam: A Call for Innovative Solutions. World Bank.

• Islam, Muhammad Nurul (2012). Microfinance & Islam. Dhaka: Zom Zom Publications. (pp. 9-75).

• Ledgerwood, Joanna (1999). Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective. World Bank Press. (p. 1).

লেখক: মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম, সিনিয়র সহকারী মুশরিফ, ইফতা বিভাগ, জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

কিমিয়া সা'দাত, সার্টিফায়েড ফিন্যান্সিয়াল কনসালট্যান্ট, সিএফসি, কানাডা

শরীয়াহ বোর্ডরুমের নানা অভিজ্ঞতা: কিছু বাস্তব শিক্ষা ও পর্যালোচনা

ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান

বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে দেশি-বিদেশি বিভিন্ন ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ বোর্ডে দায়িত্ব পালন এবং পরামর্শক হিসেবে কাজ করার সুবাদে নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি। বইয়ের পাতার তত্ত্ব আর বোর্ডরুমের কঠোর বাস্তবতার মধ্যে যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে, তা কেবল দীর্ঘ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই উপলব্ধি করা সম্ভব।

এটি স্পষ্ট যে, শরীয়াহ বোর্ডের কাজ কেবল কিছু ফতোয়া দেয়া বা কোনো প্রোডাক্টকে 'হালাল' সার্টিফাই করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি ইবাদত, আমানতদারিতা, পেশাদারিত্ব, ইন্ডাস্ট্রি ও প্রাতিষ্ঠানিক সচেতনতা এবং মানবিক যোগাযোগের এক নিবিড় সংমিশ্রণ। শরীয়াহ সুপারভিশন বা তদারকি কতটা অর্থবহ হবে, তা নির্ভর করে এমন কিছু নিয়ম ও আচরণের ওপর, যা সাধারণত কোনো আনুষ্ঠানিক স্ট্যান্ডার্ড বা নীতিমালায় লেখা থাকে না।

শরীয়াহ অ্যাডভাইজরির বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ ও দিকনির্দেশনা এই নিবন্ধে উপস্থাপন করা হয়েছে।

১. শরীয়াহ বোর্ডের দায়িত্ব একটি ইবাদত ও আমানত

শরীয়াহ বোর্ডের দায়িত্বকে সবার আগে একটি 'ইবাদত' এবং মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত 'আমানত' হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। একজন শরীয়াহ বোর্ড সদস্যের হাতে আসা প্রতিটি এজেন্ডা, প্রতিটি ডকুমেন্ট, আর্থিক বিবরণী এবং প্রতিটি অভ্যন্তরীণ নথি আখেরাতের জবাবদিহিতার অংশ হতে পারে।

শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যদের গোপনীয়তা রক্ষা করা কেবল কর্পোরেট কোনো আনুষ্ঠানিকতা বা 'নন-ডিসক্লোজার এগ্রিমেন্ট'-এর বিষয় নয়; এটি একটি গুরুতর নৈতিক বাধ্যবাধকতা। "আল-মাজালিসু বিল-আমানাহ" বা "সকল মিটিংই আমানত"— এই মূলনীতি অনুযায়ী বোর্ড মিটিংয়ের স্পর্শকাতর আলোচনা, অমীমাংসিত বিতর্ক, প্রাতিষ্ঠানিক গোপনীয় তথ্য, এসওপি (SOP) বা পিপিজি (PPG) যথাযথ অনুমতি ছাড়া বোর্ডরুমের বাইরে প্রকাশ করা কেবল অপেশাদারিত্বই নয়, বরং আমানাহর লঙ্ঘন।

২. নীতিগত স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা

শরীয়াহ বোর্ডে মতামত দেয়ার ক্ষেত্রে 'ইন্ডিপেন্ডেন্স' বা স্বাধীনতা বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। একজন শরীয়াহ স্কলারের আনুগত্য ম্যানেজমেন্ট, শেয়ারহোল্ডার বা নির্দিষ্ট কোনো গোষ্ঠীর প্রতি নয়। তাঁর আনুগত্য কেবল আল্লাহ এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি, শরীয়াহর প্রতি। প্রতিষ্ঠানের সবার সাথে মানবিক দিক থেকে সুসম্পর্ক বজায় রাখা আবশ্যক, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট অভ্যন্তরীণ 'ক্যাম্প' বা বলয়ের অংশ হওয়া যাবে না। যখন আপনি সবার আপন হবেন, কিন্তু নীতিগতভাবে শরীয়াহ ছাড়া আর কারো 'নিজস্ব লোক' হবেন না-তখনই আপনার গ্রহণযোগ্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা অটুট থাকবে, মতামতে শরীয়াহ প্রাধান্য পাবে। মনে রাখতে হবে, বোর্ডরুমে বিবেচনা হবে সম্পূর্ণ শারীয়াহর ভিত্তিতে, ম্যানেজমেন্টের ফায়দা বা কোনো চাপের মুখে নয়।

৩. প্রতিষ্ঠানের সকল কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা রাখা

শরীয়াহ বোর্ডে নতুন যোগদানের পর প্রথম পর্যায়টি হওয়া উচিত শোনার, দেখার, জানার এবং গভীরভাবে বুঝতে চেষ্টা করার। পুরোপুরি না বুঝে মতামত দেওয়ার প্রবণতা ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কাজ করার নিজস্ব ধরণ থাকে। কাগজে-কলমে সব ইসলামিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে একই রকম মনে হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে একেকটি প্রতিষ্ঠানের 'অপারেশনাল ডিএনএ' বা কর্মপদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই রিটেইল, কর্পোরেট, ডিপোজিট ও ইনভেস্টমেন্ট, ট্রেড, ট্রেজারি এবং মানি মার্কেট অপারেশনগুলো বাস্তবে কীভাবে কাজ করে, তা শুরুতেই বুঝে নেওয়া জরুরি।

ম্যানেজমেন্টের কথার ওপর পুরোপুরি নির্ভর না করে আইন বা টেকনিক্যাল বিষয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞের সহায়তা নেওয়া এবং মূল সোর্স থেকে তথ্য যাচাই করা উচিত।

প্রতিষ্ঠানের শরীয়াহ বিভাগ, শরীয়াহ অডিট, ইন্টারনাল অডিট, কম্পলায়েন্স, রিস্ক ম্যানেজমেন্ট এবং অপারেশনস টিমের সাথে সরাসরি কথা বলা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। এর মাধ্যমে বোঝা যাবে যে, শরীয়াহ নীতিমালাগুলো মাঠপর্যায়ে বা ডেস্কে কীভাবে প্রয়োগ হচ্ছে। অনেক সময় শরীয়াহ লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো ইচ্ছাকৃত হয় না, বরং অপারেশনাল শর্টকাট, সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা বা পদ্ধতিগত ভুল বোঝাবুঝির কারণে ঘটে থাকে। এই বিষয়গুলো নিরসনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিভাগগুলোর সাথে সরাসরি মতবিনিময় ও কার্যকর সমন্বয় করা প্রয়োজন।

৪. মিটিংয়ের আগে ব্যাপক প্রস্তুতি প্রয়োজন

অনেকে মনে করেন শরীয়াহ বোর্ডের কাজ কেবল মিটিংয়ে বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া। কিন্তু বাস্তবতা হলো, মিটিংয়ে কার্যকর অংশগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয় মিটিং রুমে ঢোকার অনেক আগে থেকেই। এজেন্ডা হাতে পাওয়ার পর প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে পড়া এবং পুরো নথিপত্র পর্যালোচনা করা আবশ্যক। বর্তমানে 'নোটবুক এলএম' (NotebookLM)-এর মতো আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিশাল ডকুমেন্টগুলো সহজেই বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

জটিল বা বিতর্কিত বিষয়গুলোর জন্য কেবল নিজের জ্ঞানের ওপর নির্ভর না করে 'আওফি' (AAOIFI) স্ট্যান্ডার্ড, বিভিন্ন ফিকহ কমিটির রেজুলেশন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক বা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা এবং ফিকহী কিতাব থেকে রেফারেন্সসহ প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। কোনো প্রোডাক্ট বা স্ট্রাকচার সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা বা 'তাসাওউর' (Concept realization) না থাকলে শরীয়াহ রিভিউ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে 'আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স' বা সাধারণ তথ্যের ওপর নির্ভর না করে প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ মেকানিজমটি বুঝতে হবে। প্রয়োজনে অন্যান্য নথি তলব করতে হবে, বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা বিভাগের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট করে নিতে হবে।

এজেন্ডার নথিগুলোর ওপর প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলো আগেই কাগজে বা ডিজিটালি নোট রাখা উচিত, যাতে মিটিংয়ে আলোচনার ভিড়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো হারিয়ে না যায়। বরং নোট থেকে দ্রুত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে প্রশ্ন করা যায়, স্পষ্ট হওয়া যায়।

নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান বা কোনো আইনের দোহাই দিয়ে কোনো সিদ্ধান্ত চাপাতে চাইলে সরাসরি তাদের ওয়েবসাইট বা আইনের নথি থেকে তা যাচাই করে নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ।

৫. আর্থিক বিবরণীর সূক্ষ্ম ব্যবচ্ছেদ

বছরের প্রথম মিটিংয়ে সাধারণত ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট অ্যাপ্রুভালের জন্য দেওয়া হয়। অনেক সময় ডেডলাইনের দোহাই দিয়ে দ্রুত স্বাক্ষরের জন্য পিড়াপিড়ি করা হয়, কিন্তু না দেখে অ্যাপ্রুভাল দেওয়া কোনোভাবেই উচিত নয়। তাছাড়া আর্থিক বিবরণী বা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখার সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। কেবল নির্দিষ্ট কিছু পৃষ্ঠা পড়ে এপ্রুভ করাই যথেষ্ট নয়। আয়ের উৎস (Income streams), খরচ, বিনিয়োগ, সিএসআর ও চ্যারিটি ফান্ড, জাকাত এবং ওয়াকফ একাউন্ট সংক্রান্ত হিসাবগুলো 'নোটস টু অ্যাকাউন্টস'-সহ (Notes to accounts) গভীরভাবে পড়ে দেখতে হবে। যদি শরীয়াহ বোর্ডের সদস্য হওয়ার আগের কোনো বছরের রিপোর্টের ওপর স্বাক্ষর করতে হয়, সেক্ষেত্রে তা সেসময়ের 'শারীয়াহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত বা শরীয়াহ অডিটের ভিত্তিতে'- এভাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করে দেয়া আবশ্যক।

৬. সময়জ্ঞান ও পেশাদার গাম্ভীর্য

মিটিংয়ের দিনটিতে বিশেষ ব্যক্তিগত শৃঙ্খলা প্রয়োজন। অন্তত পনেরো মিনিট আগে মিটিংস্থলে উপস্থিত হওয়া কেবল সাধারণ সময়ানুবর্তিতা নয়, এটি পেশাদারিত্ব, কাজের প্রতি গুরুত্ব ও অন্যের সময়ের প্রতি শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ। এক-দুই দিন ভিন্ন বিষয়, কিন্তু বারবার নির্ধারিত সময়ের পরে উপস্থিত হওয়াকে প্রফেশনালি খারাপ চোখে দেখা হয়। যদি কখনো অনিবার্য কারণে দেরি হয়েই যায়, তবে কোনো অজুহাত না দেখিয়ে মিটিংয়ে স্পষ্টভাবে ক্ষমা চাওয়া উচিত। মিটিংয়ের ঠিক পরপরই বা একই সময়ে অন্য কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট না রাখা উচিত, যাতে আলোচনার শেষ পর্যায়ে তাড়াহুড়ো করার প্রবণতা তৈরি না হয়।

সহকর্মীদের সাথে সালাম বিনিময় এবং সৌজন্যমূলক আচরণ একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরি করে। পোশাক-পরিচ্ছদ এবং

কথাবার্তায় গাম্ভীর্য ও পেশাদারিত্ব বজায় রাখা এবং টু-দ্য-পয়েন্টে কথা বলা একজন স্কলারের মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

মিটিংয়ে আলোচনার সময় বাগ্মীতার চেয়ে ধৈর্যের মূল্য অনেক বেশি। এজেন্ডাটি পুরোপুরি উপস্থাপিত হতে দেওয়া, অন্যদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনা এবং তারপর নিজের মতামত স্পষ্ট ও সংক্ষেপে তুলে ধরা - এটাই অভিজ্ঞ স্কলারদের বৈশিষ্ট্য। গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ বিষয়ে চুপ না থেকে নিজের মতামত দেয়া একান্ত কাম্য। প্রয়োজনে বিনয়ের সাথে ফ্লোর চেয়ে নিয়ে নিজের বক্তব্য তুলে ধরতে হবে। তবে প্রথম প্রেজেন্টেশনেই কোনো কিছুকে ভালো বা খারাপ বলে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাওয়া ঠিক নয়।

৭. ভিন্নমতের সৌন্দর্য ও শিষ্টাচার

শরীয়াহ আলোচনায় মতভেদ বা দ্বিমত থাকাটাই স্বাভাবিক। জ্যেষ্ঠ আলেম বা অভিজ্ঞ সহকর্মীদের সাথেও শ্রদ্ধাশীল ভাষা ও দলিলভিত্তিক যুক্তি উপস্থাপন করে দ্বিমত পোষণ করা যেতে পারে, এতে অন্যের জন্য তা গ্রহণ করা সহজ হবে। নিজের পছন্দের কোনো মতের পক্ষে একটি দলিল পেয়েই খুশি হওয়া (Framing Bias) যাবে না, বরং এর বিপরীত দিকটিও চিন্তা করতে হবে। উত্তপ্ত বিতর্কের সময় শান্ত থাকাটা দুর্বলতা নয়, বরং এটি আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিচায়ক। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় পরীক্ষিত, মানসিকভাবে অস্থির লাগলে মনে মনে জিকির বা দরূদ পাঠ- প্রশান্তি ফিরিয়ে আনে।

মনে রাখা উচিত, বোর্ডের সিদ্ধান্ত সাধারণত সংখ্যাগরিষ্ঠের ভিত্তিতে হয়। নিজের মত প্রতিষ্ঠিত না হলেও, দায়িত্বশীলভাবে তা উপস্থাপন করাই একজন সদস্যের প্রধান কর্তব্য। মিটিং শেষে যদি মনে হয় আলোচনার কারণে কোনো তিক্ততা সৃষ্টি হয়েছে, তবে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে নেওয়া পেশাদার সম্পর্কের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৮. কার্যকর শরীয়াহ তদারকির স্বার্থে শরীয়াহ অডিট বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ

শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যদের উচিত শরীয়াহ অডিট বিভাগের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা, মাঝেমাঝে অডিট কার্যক্রম সরাসরি প্রত্যক্ষ করা, প্রয়োজনে ব্রাঞ্চে যাওয়া। এতে শরীয়াহ সুপারভিশনকে আরও শক্তিশালী করা হবে। শরীয়াহ অডিট মিটিংয়ে উপস্থিত থাকলে অডিটের স্যাম্পলিং পদ্ধতি এবং সিস্টেমের দুর্বলতাগুলো বোঝা সহজ হয়।

শরীয়াহ অডিট রিপোর্টে কেবল চিহ্নিত সমস্যার তালিকা থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। বরং প্রতিটি ফাইন্ডিংয়ের বিপরীতে এর 'মূল কারণ' (Root cause) কী, তা খুঁজে বের করে উল্লেখ করা দরকার। পাশাপাশি সমস্যা সমাধানের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা (Deadline) এবং দায়িত্বশীল ব্যক্তি বা বিভাগ (Owner) নির্ধারণ করা জরুরি। এছাড়া আগের মিটিংয়ের অমীমাংসিত বিষয় ফলোআপ করা এবং এর 'অ্যাকশন লগ' রাখা আবশ্যক। কোনো সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তা 'Matters Arising' নামে এজেন্ডায় অন্তর্ভুক্ত রাখা এবং নিয়মিত প্রতি মিটিংয়ে আপডেট করা প্রয়োজন। কেননা অমীমাংসিত ইস্যুগুলো ফলোআপ না করলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে আর বাস্তবায়ন করা হয় না।

ডিপোজিটরদের মধ্যে লাভের বণ্টন (Profit Distribution) চুক্তি- বাস্তবতার নিরিখে যাচাই করা জরুরী। এক্ষেত্রে 'কোর ব্যাংকিং সিস্টেম' (Core Banking System) থেকে সরাসরি প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠানের লাভ-লস যাচাই করা উচিত, নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে নয়।

জাকাত, চ্যারিটি এবং ওয়াকফ ফান্ডের ক্ষেত্রে শরীয়াহ বোর্ডকে ট্রাস্টি বা আমানতদারের ভূমিকা পালন করতে হবে। এগুলো ব্যাংকের নিজস্ব আয় নয়, বরং আমানত। তাই এই ফান্ডগুলোর যথাযথ পৃথকীকরণ (Segregation), স্বচ্ছ হিসাবরক্ষণ এবং সঠিক খাতে ব্যয় নিশ্চিত করা অপরিহার্য। যেখানে সুশাসনের অভাব রয়েছে, সেখানে স্বতন্ত্র তদারকি কাঠামো (Independent Oversight Mechanism) গড়ে তোলার জন্য বোর্ডকে জোরালো ভূমিকা রাখতে হবে।

৯. আগামীর চ্যালেঞ্জ ও শিখতে থাকার মানসিকতা

একজন শারীয়াহ সদস্যকে সর্বদা ডাইনামিক হতে হবে। বর্তমান যুগে শরীয়াহ তদারকি কেবল চুক্তিনামা বা কাগজ-কলমে সীমাবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়।। ব্যাংকের ওয়েবসাইট, মোবাইল অ্যাপ এবং সোশ্যাল মিডিয়া কন্টেন্টগুলো সাধারণ মানুষের মনে প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা ও ভাবমূর্তি তৈরি করে। তাই পাবলিক মেসেজিং বা বিজ্ঞাপনগুলো শরীয়াহসম্মত ও নীতিগতভাবে সঠিক কিনা, তা নিয়মিত তদারকি করা এখন সময়ের দাবি।

দীর্ঘদিনের কাজের অভিজ্ঞতায় সবচেয়ে বড় যে শিক্ষাটি পেয়েছি, তা হলো - শিখতে থাকার কোনো বিকল্প নেই। নতুন নতুন প্রোডাক্ট, ফিনটেক (Fintech), প্রযুক্ত, আইন, ব্যবসার

বাস্তবতা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট এবং রেগুলেটরি পরিবর্তন প্রতিনিয়ত এই ক্ষেত্রটিকে নতুন করে সাজাচ্ছে। কোনো বিষয় জানা না থাকলে তা স্বীকার করা এবং প্রয়োজনে বুঝে নেওয়ার জন্য সময় চাওয়াটা সততার পরিচয়।

বুদ্ধিবৃত্তিক সততা বা 'ইন্টেলেকচুয়াল অনেস্টি' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে দেওয়া কোনো মতামতে ভুল থাকলে তা স্বীকার করে সংশোধন করে নেওয়া স্কলারের মর্যাদা কমায় না, বরং বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয় স্বচ্ছতার মাধ্যমে, পাণ্ডিত্য জাহির করার মাধ্যমে নয়।

উপসংহার

শরীয়াহ বোর্ডের ভূমিকা কেবল সভা পরিচালনা বা রেজুলেশন পাস করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি উপস্থিতি, সততা, ব্যাপক প্রস্তুতি, বিনয় এবং সাহসিকতার এক অনন্য সমন্বয়। এই গুরুদায়িত্ব পালনের অনেক ধাপই নীরবে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সম্পন্ন হয়। কিন্তু যখন এই দায়িত্ব নিষ্ঠা ও পূর্ণ পেশাদারিত্বের সাথে পালন করা হয়, তখন তা কেবল একটি পেশাগত দায়িত্ব থাকে না - বরং তা প্রতিষ্ঠানের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং হালাল অর্থনীতির প্রসারের সহযোগিতার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের এক মহৎ ইবাদতে পরিগণিত হয়।

লেখক: ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান, ফাউন্ডার এন্ড ডিরেক্টর, আদল অ্যাডভাইজরি, মালয়েশিয়া

বাংলাদেশ ব্যাংকের কেন্দ্রীয় শরীয়াহ এডভাইজরি বোর্ড ও বিসেকের শরীয়াহ এডভাইজরি কাউন্সিলের সদস্য হলেন দুইজন আলেম অর্থনীতিবিদ

দেশের ইসলামি ব্যাংকগুলো শরীয়াহসম্মতভাবে পরিচালনার জন্য প্রথমবারের মতো কেন্দ্রীয় শরীয়াহ এডভাইজরি বোর্ড (SAB) গঠন করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। উক্ত বোর্ডের সদস্য মনোনীত হয়েছেন আলেম অর্থনীতিবিদ ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান।

তিনি মালয়েশিয়ার শরীয়াহ কন্সালটেন্সি ফার্ম আদল অ্যাডভাইজরির ফাউন্ডার ও ডিরেক্টর। এছাড়াও তিনি সিকিউরিটিজ কমিশন মালয়েশিয়ার একজন রেজিস্টার্ড শরীয়াহ অ্যাডভাইজর। পাশাপাশি বাহরাইনের আন্তর্জাতিক শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নকারী প্রতিষ্ঠান Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) এর মাস্টার ট্রেইনার।

ইতিপূর্বে তিনি বাংলাদেশের বিভিন্ন ইসলামী ব্যাংক এবং স্টক এক্সচেঞ্জের শরীয়াহ বোর্ডের সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এভাবে গ্লোবাল ইসলামী ফিন্যান্স ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি বিভিন্ন পর্যায়ে ইতিবাচক অবদান রেখে যাচ্ছেন।

অপরদিকে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (BSEC) এর শরীয়াহ এডভাইজরি কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত হয়েছেন বিদগ্ধ লেখন ও আলেম অর্থনীতিবিদ মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম।

তিনি রাজধানী ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ ঢাকায় সিনিয়র সহকারী মুফতী হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের তৃণমূল পর্যায় থেকে সর্বস্তরে ইসলামী অর্থনীতি নিয়ে বিভিন্ন কোর্স ও শরীয়াহ কনসালটেন্সি কার্যক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান আইএফএ কন্সালটেন্সির ফাউন্ডার এবং ডিরেক্টর।

সরকারী সুকুক: গভর্নেন্স ও নীতিগত কাঠামো বিষয়ক গবেষণাধর্মী বিশ্লেষণ

[এটি বাংলাদেশের সরকারী সুকুকের গভর্নেন্স ও নীতিগত উন্নয়নমূলক প্রস্তাবনা সম্বলিত একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত রূপ। যা বাংলাদেশ সরকারের ৬ষ্ঠ সুকুক ইস্যুর প্রাক্কালে মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী থেকে মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম ও ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান হাফি. এর তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত করা হয় এবং ১৪ ই আগস্ট ২০২৫ এর উপর ভিত্তি করে একটি ফিকহী মজলিসেরও আয়োজন করা হয় মাদরাসা প্রাঙ্গনে। যেখানে দেশের বরেণ্য মুফতিয়ানে কেরামও উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীতে এটি মাদরাসার পক্ষ থেকে বাংলাদেশ ব্যাংকে পাঠানো হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ডিরেক্টর জনাব ইস্তেকমাল হোসেন সাহেব তা গ্রহণ করেন এবং প্রস্তাবিত শরীয়াহ মতামতগুলোতে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করেন। পুরো গবেষণাটি দীর্ঘ হওয়ায় ত্রৈমাসিক ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্সের পাঠকদের সামনে তা সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করা হচ্ছে। -নির্বাহী সম্পাদক]

ভূমিকা

বর্তমান সময়ে বিশ্বময় অন্যতম আলোচিত ইসলামিক ফাইন্যান্স প্রোডাক্টসমূহের একটি হল 'সুকুক', যা মূলত ইসলামী শরীয়াহর আলোকে গঠিত সমমূল্যের বিনিয়োগ সার্টিফিকেট। এটি তারল্য ব্যবস্থাপনা, বাজেট ঘাটতি মোকাবিলা এবং অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য একটি টেকসই বিকল্প হিসেবে বিশ্বব্যাপী বিপুল জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের সরকারও সুকুক ইস্যুর মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিতে একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে, যেখানে অর্থ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংক বিশেষ ভূমিকা রেখে যাচ্ছে।

বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে সুকুক ইস্যু করার কাজে নিয়োজিত বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (Islamic Securities Section, Debt Management Department, Bangladesh Bank) শুরু থেকেই সুকুকের গভর্নেন্স, কাঠামো ও নীতিগত মান উন্নয়নে নানা সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন এবং এখনও তাদের সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এ জন্য তাঁরা দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ পাওয়ার দাবি রাখেন। তবে অব্যাহত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সুকুক গভর্নেন্স ও শরীয়াহ-উভয় ক্ষেত্রে এখনও বেশ কিছু দুর্বলতা রয়ে গিয়েছে। যা বিদ্যমান সরকারী সুকুকের গভর্নেন্স ও শরীয়াহ কাঠামোর স্বচ্ছতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যাচ্ছে দীর্ঘ দিন ধরে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সম্প্রতি ২০ মে ২০২৫ ইং বাংলাদেশ সরকারের ইস্যুকৃত ৬ষ্ঠ সুকুকে এধরনের শরীয়াহ ও গভর্নেন্স সমস্যাবলি পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং এর উন্নয়ন সম্ভাবনা ও করণীয় প্রস্তাবনা তুলে ধরা হয়েছে।

সুকুকের সূচনা ও বর্তমান চিত্র

আধুনিক সুকুকের জন্মস্থান বলা হয় 'জর্ডান'কে। ১৯৭০ দশকে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর দেশের অবহেলিত ওয়াকফ সেক্টরকে অর্থনৈতিকভাবে অগ্রসর করার জন্য সুদী বন্ডের বাহিরে গিয়ে সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে মুদারাবা ভিত্তিক সুকুক ইস্যু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৯০ সালে শেল এমডিএস (মালয়েশিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে প্রথম কর্পোরেট সুকুক ইস্যু করার রেকর্ড সৃষ্টি করে। (Sukuk; Principles and practices, ISRA, P:৬১)

'আইআইএফএম সুকুক প্রতিবেদন-২০২৪ এর তথ্যানুসারে বিশ্বব্যাপী ইসলামি ফিনান্স ইন্ডাস্ট্রির (IFSI) মধ্যে প্রায় এক চতুর্থাংশ অর্থমূল্য এখন সুকুকে রয়েছে। ২০২৩ সালের শেষে বৈশ্বিক সুকুক বাজারে ১৬% বা ২১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ প্রবৃদ্ধি ঘটেছে। যা সুকুককে একটি প্রধান শরীয়াহ্-সম্মত অর্থায়নের মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে। (প্রতিবেদন,

পৃ. ১৭, ২৫) সুকুক এখন শুধুই একটি বিকল্প নয় বরং মূলধারার অর্থায়ন কাঠামোতে পরিণত হয়েছে, বিশেষ করে রাষ্ট্রীয় ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পে।

বাংলাদেশ সরকারের সুকুকের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

২৯ মে, ২০১৯ সালে পুঁজিবাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা 'বিএসইসি' সুকুক বিষয়ে প্রথম গেজেট প্রকাশ করে। এরপর গত ৮ অক্টোবর, ২০২০ সালে অর্থ-মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ থেকে সরকার কর্তৃক সুকুক ইস্যু ও ব্যবস্থাপনা সম্পৃক্ত গাইডলাইন প্রকাশিত হয়। সর্বশেষ গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০২০ সালে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণ ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধীন "Islamic Securities Section" (ইসলামিক সিকিউরিটিজ বিভাগ) থেকে প্রকাশিত হয় বাংলাদেশ সরকারের ইনভেস্টমেন্ট সুকুকের প্রসপেক্টাস।

উক্ত বিভাগ ২৮ ডিসেম্বর ২০২০ বাংলাদেশ ব্যাংক সরকারের পক্ষে প্রথম সুকুক ইস্যু করে। সুকুকের অবকাঠামো ছিল- ইজারা ভিত্তিক সুকুক। এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের সরকারি অর্থব্যবস্থায় এক নতুন যুগের সূচনা ঘটে। সুকুকের উদ্দেশ্য ছিল- পুরো দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ। উক্ত সুকুক প্রকল্পে অর্থের পরিমাণ ছিল আট হাজার কোটি টাকা। যা দুটি ভাগে নিলামের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। দ্বিতীয় ভাগের নিলাম অনুষ্ঠিত হয় ৩১ মে ২০২১।

৩০ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের চাহিদাভিত্তিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (প্রথম পর্যায়) এর জন্য দ্বিতীয় সুকুক ইস্যু করে। এটিও ছিল ইজারা সুকুক। এই সুকুকের অর্থের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার কোটি টাকা।

১৯ এপ্রিল ২০২২ সালে তৃতীয় বারের মত 'গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীন অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে Important Rural Infrastructure Development Project on priority basis -৩ (IRIDP-৩ Social Impact Sukuk)' এর অধীনে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ (Islamic Securities Section, Debt Management Department, Bangladesh Bank) সুকুক ইস্যু করে। এই সুকুকের অর্থের পরিমাণ ছিল ৫ হাজার কোটি টাকা। সুকুকটির শরীয়াহ কাঠামো ছিল Istisna'a followed by Ijarah (প্রথমে ইস্তিসনা ও পরবর্তীতে ইজারা)।

২৬ মে, ২০২৪ তারিখে, চতুর্থ বারের মতো 'চট্টগ্রাম বিভাগে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে সড়ক প্রশস্তকরণ এবং মজবুতকরণ প্রকল্প Chattogram Division Upazila & Union Road Widening & Strengthening Project (CDWSP)' শিরোনামে সুকুক ইস্যু করা হয়। সুকুকের অর্থের পরিমাণ ছিল ১ হাজার কোটি টাকা। সুকুকটির শরীয়াহ কাঠামো ছিল Istisna'a followed by Ijarah (প্রথমে ইস্তিসনা ও পরবর্তীতে ইজারা)।

১৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখে, পঞ্চম বারের মতো সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ আরেকটি সুকুক ইস্যু করে। এর উদ্দেশ্য ছিল, গ্রামীণ সড়কসমূহে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ (পর্যায়-২) (Construction of Important Bridges on Rural Roads (Phase-II) (CIBRR-২)। এই ব্যাপক প্রকল্পটির মধ্যে ৮২টি সেতু নির্মাণ, ৩৮,৮০০ মিটার সংযোগ সড়ক এবং ৮,২৩০ মিটার প্রয়োজনীয় নদী ব্যবস্থাপনা কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে বলে প্রসপেক্টাসে উল্লেখ করা হয়। এতে ইস্যুকৃত অর্থের পরিমাণ ছিলো ৩ হাজার কোটি টাকা। সুকুকটির শরীয়াহ কাঠামো ছিল ইস্তিসনা ও ইজারা।

১৩ মে ২০২৫ তারিখ সরকারের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট বিভাগ ৬ষ্ঠ সুকুক প্রসপেক্টাস ইস্যু করে। যার অকশন অনুষ্ঠিত হয় ১৯ মে এবং ইস্যুয়িং শুরু হয় ২০ এ মে ২০২৫ থেকে। এর উদ্দেশ্য 'রাজশাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়নসমূহের সড়ক প্রশস্তকরণ ও মজবুতকরণ' প্রকল্প - 'Rajshahi Division Important Upazila & Union Road Widening & Strengthening (RDIRWSP)। সুকুক ইস্যু অর্থের পরিমাণ ছিল ২ হাজার কোটি টাকা। সুকুকটি শরীয়াহ কাঠামো হচ্ছে ইস্তিসনা ও ইজারা।

সুকুক এর পরিচয়

'সুকুক' শব্দটি মূলত বহুবচন। এর একবচন 'ছক্ক'। মূল শব্দটি ফার্সী। সেখান থেকে আরবী 'ছাক্কুন' শব্দের উৎপত্তি। এরপর এর বহুবচন 'সুকুক'। এর শাব্দিক অর্থ: সার্টিফিকেট, দলীল দস্তাবেজ, যা কোনো সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে। যেমন— জমির দলীল। (আল-মিসবাহুল মুনীর, পৃ. ১৮০)

প্রায়োগিক দৃষ্টিকোণ থেকে ঐতিহাসিকভাবে 'সুকুকের' তিনটি অর্থ ও প্রয়োগ দেখা যায়। যথা-

ক. রাষ্ট্রীয় ভাতা প্রাপ্তির সার্টিফিকেট। এই ব্যবহারটি ৬৫ হিজরীতে উমাইয়া শাসনামলে পাওয়া যায়। মদিনার গভর্নর তখন মারওয়ান ইবনে হাকাম। ঐ সময়ে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে প্রদেয় ভাতা প্রাপ্তির জন্য বিশেষ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছিল। যা 'সুকুক' নামে পরিচিত ছিল। এই সুকুক দিয়ে নির্ধারিত স্থান থেকে রাষ্ট্রীয় ভাতা হিসাবে খাদ্যদ্রব্য উত্তোলন করা যেত। সেকেন্ডারি মার্কেটে সেটি লেনদেনও হতো। যিনি এই সুকুক লাভ করতেন, তিনি খাদ্যদ্রব্য উত্তোলন না করে অন্যত্র বিক্রয় করে দিতেন। তবে সেটি হাদীসে নিষিদ্ধ পণ্য হস্তগত করার আগেই বিক্রয় করার নামান্তর ছিল। তাই তৎকালীন সাহাবায়ে কেরামের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয়ভাবে এর সেকেন্ডারি লেনদেন বন্ধ করে দেয়া হয়। (সহীহ মুসলিম, ৩৭৩৯)

খ. কোনো সম্পদের ডকুমেন্ট/সার্টিফিকেট। যেমন— ওয়াকফ সম্পদের দলীল। হিজরী পঞ্চম শতাব্দিতে এ অর্থে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। (রদ্দুল মুহতার, ১৩/৫৯২)

গ. সুদী বন্ডের বিকল্প হিসাবে 'বিশেষ শরীয়াহসম্মত সার্টিফিকেট'। এ অর্থেই বর্তমানে ব্যবহৃত হয়।

সুকুক ও বন্ড

প্রচলিত সুদভিত্তিক বন্ড ও সুকুকের মধ্যে মূল সাদৃশ্য হলো, উভয়টিই আর্থিক হাতিয়ার (Financial tools) হিসেবে বাজার তথা জনসাধারণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তহবিল আহরণের মাধ্যমে উন্নয়ন, অবকাঠামো, শিল্প ও বাণিজ্যিক অর্থায়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। তবে উভয়ের মধ্যে নীতি, প্রায়োগ ও কাঠামোর ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। সুকুক সব সময় সম্পদের প্রতিনিধিত্ব করে, যা বন্ডে অনুপস্থিত। বন্ড মূলত সুদবাহী আর্থিক প্রোডাক্ট। পক্ষান্তরে সুকুক সম্পূর্ণ সুদমুক্ত শরীয়াহসম্মত আর্থিক প্রোডাক্ট। বন্ড সব সময় ঋণ ও সুদের মিশ্রণে তৈরি হয়। অপরদিকে সুকুকের কাঠামো বিনিয়োগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুপাতে নানা রকম হতে পারে। কখনো এর অবকাঠামো তৈরি হয় মুরাবাহা ভিত্তিতে, কখনো ইস্তেসনা, কখনো ইজারা ভিত্তিতে।

সুকুকের প্রকারভেদ

শরীয়াহসম্মত চুক্তি অনুযায়ী সুকুক চার প্রকার হতে পারে। যথা-

(১) অংশীদারি পদ্ধতির সুকুক, যেমন মুশারাকা ও মুদারাবা সুকুক;
(২) ইজারা পদ্ধতির সুকুক;
(৩) ক্রয়-বিক্রয় পদ্ধতির সুকুক, যেমন মুরাবাহা সুকুক, ইসতিসনা সুকুক ও সালাম সুকুক
(৪) এজেন্সি-ভিত্তিক সুকুক, যেমন ওকালা সুকুক।

একাধিক পদ্ধতির সুকুক নিয়ে মিশ্র সুকুকও গঠন করা হয়, যা হাইব্রিড সুকুক নামে পরিচিত। ইস্যুকারীরা প্রধানত বাস্তব চাহিদা, মেয়াদ ও প্রাপ্ত অন্তর্নিহিত সম্পদের আলোকে সুকুকের একটি শ্রেণী নির্বাচন করে থাকেন।

অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানার ভিত্তিতে সুকুক দুই প্রকার হতে পারে। যেমন অ্যাসেট ব্যাকড সুকুক এবং অ্যাসেট বেইসড সুকুক। Special Purpose Vehicle (SPV) এর কাছে অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানা হস্তান্তর করে সুকুক ইস্যু করা হলে তা হয় অ্যাসেট ব্যাকড (Asset Backed) সুকুক। এবং এসপিভির কাছে অন্তর্নিহিত সম্পদের মালিকানা নয়, বরং অন্তর্নিহিত সম্পদের উপকারের মালিকানা (Beneficial ownership) হস্তান্তর করে সুকুক ইস্যু করা হলে তা অ্যাসেট বেইসড (Asset Based) সুকুক হিসেবে অভিহিত করা হয়। সাধারণত ইজারা বা লিজ ভিত্তিক সুকুকগুলো অ্যাসেট বেইসড সুকুক হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ সরকারের সুকুক কাঠামো

সুকুকের শরীয়াহ পর্যালোচনা জানার আগে এর কাঠামো বিশ্লেষণ করা জরুরী। বাংলাদেশ সরকারের সুকুকে মৌলিকভাবে এখানে পাঁচটি পক্ষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। যথা-

ক. অরিজিনেটর (Originator): এর অর্থ, সুকুক ইস্যুর মাধ্যমে যে মূলধন উত্তোলন করতে আগ্রহী। সুকুকের মূল প্রস্তাবক। এখানে সেই পক্ষ হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। যার পক্ষে কাজ করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ।

খ. ইস্যুয়ার (Issuer): এর অর্থ, সম্পদের বিপরীতে সরকার (অরিজিনেটর) এর পক্ষে সুকুক ইস্যু করার জন্য নিযুক্ত পক্ষ। এখানে সেই পক্ষ হলো, বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের অধীনস্ত Islamic Securities Section। এই বিভাগ সুকুক এর এসপিভি (SPV-Special purpose vehicle) হিসাবেও কাজ করে থাকে। উক্ত সেকশন এক সময় ঋণ ব্যবস্থাপনা বিভাগের ৫ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে

গঠিত হতো। সম্প্রতি এটি ৪ সদস্য দ্বারা গঠিত হয়। বর্তমান ৬ষ্ঠ সুকুকেও এটি ৪ জন সদস্য দ্বারা গঠিত হয়েছে। এক সময় এর প্রধান ছিলেন-ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার। বর্তমানে এর প্রধান হচ্ছেন-এডিশনাল ডিরেক্টর, ঋণ ব্যবস্থাপনা বিভাগ। বাকি তিন সদস্য হলেন-জয়েন্ট ডিরেক্টর, ডেপুটি ডিরেক্টর ও এসিস্টেন্ট ডিরেক্টর (ঋণ ব্যবস্থাপনা বিভাগ)। প্রথম দিকে এসিস্টেন্ট দু'জন নেয়া হয়েছিল। এখন একজন নেয়া হয়েছে ।

গ. ট্রাস্টি (Trustee): এর অর্থ— এমন পক্ষ, যারা সুকুক হোল্ডারদের স্বার্থ সংরক্ষণ, এসপিভির কার্যক্রম তত্ত্বাবধানের কাজে নিয়োজিত থাকে। পাশাপাশি অরিজিনেটরের সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুসারে প্রসপেক্টাসে বর্ণিত দলিলাদির তত্ত্বাবধান ও গ্যারান্টি প্রদানের দায়িত্বও পালন করে থাকে। উক্ত ট্রাস্টি কমিটি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন বিভাগের উচ্চপদস্থ ৬ জন কর্মকর্তা দ্বারা গঠিত হয়। এর প্রধান ও চেয়ারম্যান হিসাবে থাকেন বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর। ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ যার অধীনে। ৬ জন সদস্যের মধ্যে তিনজনই 'ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট' এর কর্মকর্তা। (বাকি দু'জন-ডিরেক্টর ও এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর)। উক্ত ডিপার্টমেন্ট-এর একটি সেকশন-ই মূলত ইস্যুয়ার।

ঘ. বাংলাদেশ সরকারের সুকুকের শরীয়াহ চুক্তি: বাংলাদেশ সরকারের এ পর্যন্ত প্রকাশিত সুকুকসমূহের মধ্যে ইজারা ও ইস্তিসনা চুক্তি দুটির মিশ্রণ রয়েছে। প্রথম তিনটি সরাসরি ইজারা কাঠামোর ছিল বলে প্রসপেক্টাসে উল্লেখ করা হয়েছিল। যদিও বাস্তবে সেগুলোতেও ইস্তিসনা কাঠামোর মিশ্রণ ছিল। এর ফলে শেষোক্ত ৩টি সুকুক প্রসপেক্টাসে সুকুক কাঠামো হিসাবে ইস্তিসনাকে প্রথম চুক্তি ও লীজ চুক্তিকে দ্বিতীয় পর্যায়ের চুক্তি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুকুক কাঠামোর বাস্তবতার বিচারে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ কাঠামোর বিবরণ অধিক বাস্তবসম্মত হয়েছে।

ঙ. গ্যারান্টার (Guarantor): সুকুক কাঠামোর মধ্যে সুকুক হোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার জন্য গ্যারান্টর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। বাংলাদেশ সরকারের সুকুকে মূলত দু'ধরনের গ্যারান্টি প্রদান করা হয়। যথা-ক. অপারেশনাল গ্যারান্টি (Operational Guarantee), খ. আর্থিক গ্যারান্টি (Financial Guarantee)। অপারেশনাল গ্যারান্টি হল, সুকুক অ্যাসেট (যেমন রাস্তা, ব্রিজ) নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত পক্ষ কর্তৃক সুকুক এ্যাসেটের রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের দায়িত্ব গ্রহণ। বর্তমান ৬ষ্ঠ সুকুকের নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান হলো LGED। যারা সুকুকের এসেট নির্মাণ এবং তৎপরবর্তী সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব (গ্যারান্টি) গ্রহণ করেছে।

আর্থিক গ্যারান্টি হল, পর্যায়ভিত্তিক মুনাফা পরিশোধের নিশ্চয়তা দেয়া অর্থাৎ, নির্ধারিত সময় পরপর (যেমন: ৬ মাস অন্তর) সুকুক হোল্ডারদের যে মুনাফা বা লাভ পরিশোধ করা হবে, তার নিশ্চয়তা প্রদান করা। এটি মূলত সুকুক থেকে ধারাবাহিক আয়ের নিশ্চয়তা। পাশাপাশি সুকুকের মেয়াদ শেষে (যেমন ৫ বছর পর) সুকুক হোল্ডারকে মূলধন ফেরত দেওয়ার নিশ্চয়তা। এটি হল মূলধন ফেরতের গ্যারান্টি। তাছাড়া ইজারা সম্পদ প্রস্তুতের আগেই সুকুক হোল্ডারদেরকে ভাড়া পরিশোধের নিশ্চয়তাও উক্ত গ্যারান্টির আওতাভুক্ত।

৬ষ্ঠ সুকুক প্রসপেক্টাসে উপরোক্ত সবকটি গ্যারান্টির কথা স্পষ্ট বলা হয়েছে। তাতে আছে-

"Guarantee declaration by TDMW for periodic and redemption payments to the Sukuk holders". (P.০৮)

"Additionally, TDMW provides a Guarantee Declaration to the SPV for timely periodic and redemption payments if LGED fails to develop and construct the Sukuk Assets or in the event of total or partial loss of the Sukuk Assets". (P.১৩)

"...whether as advance rental payments or under the guarantee by the TDMW, and will make efforts to disclose these to the Sukuk holders periodically". (P.১৩)

মূলত সুকুক কাঠামোতে উক্ত দ্বিতীয় প্রকার গ্যারান্টি-ই সুকুক হোল্ডারকে আকৃষ্ট করে। এ ধরনের গ্যারান্টির মাধ্যমে তারা তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন, নিয়মিত রিটার্ন ও মুনাফার গ্যারান্টি পেয়ে থাকে। সরকারি সুকুক কাঠামোতে এই গ্যারান্টি সাধারণত অরিজিনেটর তথা অর্থমন্ত্রণালয়ের ফিন্যান্স ডিভিশনের ট্রেজারি ও ঋণ ব্যবস্থাপনা শাখা উইং (Treasury and Debt Management Wing (TDMW), Finance Division, Ministry of Finance) প্রদান করে আসছে। বিগত ৪র্থ, ৫ম ও বর্তমান ৬ষ্ঠ সুকুক কাঠামোতে এমনটিই আছে।

ঙ. শরীয়াহ বোর্ড: এর অর্থ, যারা সুকুক ইস্যুর ক্ষেত্রে শরীয়াহ বিষয়ক মতামত ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। সুকুকটি শরীয়াহ দিক থেকে আপত্তিমুক্ত এমন সিদ্ধান্ত তাঁরা দিয়ে থাকেন। ৬ষ্ঠ সুকুক প্রসপেক্টাসে উক্ত বোর্ড ১২ জন সদস্য দ্বারা গঠিত। চেয়ারম্যান হিসাবে আছেন ডেপুটি গভর্নর। তিনিই আবার ট্রাস্টির প্রধান হিসাবে আছেন।

নিম্নে বিদ্যমান সুকুকের শরীয়াহ কাঠামো ও গভর্নেন্স বিষয়ক সমস্যা, তার সমাধান, উন্নয়ন সম্ভাবনা ও করণীয় প্রস্তাবনা তুলে ধরা হলো।

শরীয়াহ গভর্নেন্স এর দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাবলি এবং তার সমাধান ও প্রস্তাবনা

১. সুকুক ইস্যু কাঠামো উন্নয়ন (পৃথক ইস্যুয়ার ও SPV প্রতিষ্ঠা করা)

বাংলাদেশে সরকারের ইস্যুকৃত সুকুক ইস্যুর জন্য স্বতন্ত্র কোন কোম্পানি বা আইনগত সত্তা নেই। বরং এর ইস্যুয়ার হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেট ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধীন Islamic Securities Section। পাশাপাশি তারা সুকুকের এসপিভি (SPV-Special purpose vehicle) এবং নীতিনির্ধারক হিসাবেও কাজ করে থাকে। এটি সুকুকের স্বচ্ছতা পরিপন্থী। সুকুকের শরীয়াহ গভর্নেন্সের নীতি হলো, SPV অবশ্যই অরিজিনেটর থেকে সম্পূর্ণ পৃথক এবং Legal Entity এর ধারক হতে হবে। অরিজিনেটরের সাথে SPV এর কোন প্রকার সম্পর্ক থাকা সুকুক গভর্নেন্সের নীতির পরিপন্থী। (দ্রষ্টব্য, AAOIFI Governance Standard (GS) ১২, Sukuk Governance, ৩৬: ৫। আরো দেখুন, AAOIFI Shari'ah Standard no ৬২:১০-৬ (draft)।

সমাধান ও প্রস্তাবনা: এক্ষেত্রে সমাধান হলো, সরকারী সুকুক ইস্যুর জন্য একটি স্বতন্ত্র ও নিবন্ধিত আইনি সত্তা (Legal Entity) প্রতিষ্ঠা করা। যেটি সরকারী সুকুকের ইস্যুয়ার এবং SPV হিসাবে দায়িত্ব পালন করবে। পাশাপাশি তারা ট্রাস্টির ভূমিকাও পালন করতে পারবে। এটি স্বতন্ত্র আইনি সত্তা (legal entity) হওয়ায় এর আর্থিক কার্যক্রম আলাদাভাবে নিরীক্ষণযোগ্য (auditable) এবং স্বচ্ছ (transparent) থাকবে।

সরকারি ঋণ আইন, ২০২২ (Public Debt Act, ২০২২) এর ধারা ০৮ এর উপধারা ০২-এ বলা হয়েছে-সরকার এসপিভি বা ট্রাস্ট্রি হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংককে নিযুক্ত করিতে পারিবে।

এখানে "পারিবে" শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, বাংলাদেশ ব্যাংক ছাড়া বিকল্প SPV গঠনের আইনি সুযোগ রয়েছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, যা নীতিনির্ধারকদের স্বাধীনভাবে একটি পৃথক ইস্যুয়ার প্রতিষ্ঠা করার আইনগত ভিত্তি প্রদান করে।

অতএব আমাদের প্রস্তাবনা হল, বাংলাদেশে সরকারি সুকুক গভর্ণেন্সে স্বচ্ছতা, শরীয়াহ পরিপালন ও আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের উচিত একটি স্বতন্ত্র ইস্যুয়ার প্রতিষ্ঠান গঠন করা। যার নাম হতে পারে Government Sukuk Company of Bangladesh-GSCB (প্রস্তাবিত)। যার বৈশিষ্ট্য হবে-

- এটি অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীন ১০০% সরকারি মালিকানাধীন কোম্পানি হবে।
- এটি সুকুক ইস্যু, বিনিয়োগকারীদের পক্ষে সুকুক সম্পদ হেফাজত এবং বিনিয়োগকারীদের পক্ষে SPV হিসাবে কাজ করবে।
- পাশাপাশি এটি সুকুকের ট্রাস্টির দায়িত্বও পালন করতে পারে।
- এর পৃথক অডিট, রিপোর্টিং ও লিগ্যাল কাঠামো থাকবে, যা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড ও শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী সুকুক ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করবে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের ভূমিকা কী হবে?

সরকারী সুকুক ইস্যুর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের অনুশীলন হলো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা কেবল সরকারের অর্থ স্থানান্তর এবং তহবিল পরিচালনার ভূমিকায় থাকে। যেমন পাকিস্তানের সরকারী সুকুক কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অংশগ্রহণ কেবল সরকারের অর্থ স্থানান্তরের মাঝে সীমিত।

কিন্তু বাংলাদেশের সরকারী সুকুক কাঠামোর মধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় ব্যাংক সুকুকের প্রায় সকল দায়িত্ব-ই পালন করে থাকেন। সুকুক ইস্যু, ট্রাস্ট্রি, শরীয়াহ অ্যাডভাইজরী, পেমেন্ট ইত্যাদি কাজ একই প্রতিষ্ঠান আঞ্জাম দিয়ে থাকে। এভাবে সুকুক ইস্যুকরণ, কাঠামো নির্মাণ, শরীয়াহ মতামত, ট্রাস্টি সবই একই ছাদের নিচে হওয়াটা "Conflict of Interest" ও "Lack of segregation of duties" সমস্যার জন্ম দেয়ার সম্ভাবনা তৈরি করে।

২. শরীয়াহ বোর্ড কাঠামো উন্নয়ন

সুকুক যেহেতু একটি ইসলামী বিনিয়োগ উপকরণ (Islamic financial instrument) এবং এতে সাধারণ জনগণ শরীয়াহ সম্মত পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করে থাকে, তাই সুকুকের শরীয়াহ দিকটি অবশ্যই সবচেয়ে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ এবং গ্রহণযোগ্য হওয়া উচিত। এক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী ও স্বাধীন শরীয়াহ বোর্ড কাঠামো অপরিহার্য।

কিন্তু বাংলাদেশ সরকারের সুকুকের শরীয়াহ বোর্ড বিভিন্ন দিক থেকে প্রশ্নবিদ্ধ। আমরা ইতিপূর্বে শরীয়াহ বোর্ড কাঠামো উল্লেখ করেছি। সেখানে চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নর, যিনি একইসাথে সুকুক ট্রাস্টিরও প্রধান। এই কাঠামোতে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ শরীয়াহ ও গভর্নেন্স আপত্তি দেখা দেয়:

আপত্তি (ক): অশরীয়াহ পেশাজীবী দ্বারা শরীয়াহ বোর্ডের নেতৃত্ব

শরীয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান শরীয়াহ বিষয়ে প্রাতিষ্ঠানিক যোগ্যতাহীন হলে, শরীয়াহ পর্যালোচনার স্বতন্ত্রতা ও গ্রহণযোগ্যতা প্রশ্নবিদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক শরীয়াহ গভর্নেন্স নীতি হলো, শরীয়াহ সদস্যগণ ফকীহ হতে হবে, ফিক্বহী যোগ্যতার ধারক হতে হবে। যেন মুজতাহিদ ইমামদের বক্তব্য বুঝতে পারেন এবং নির্ধারিত নীতিমালার আলোকে ফিক্বহী মাসাআলা ও নিত্য-নতুন সমস্যা সমাধান করতে পারেন। (দ্রষ্টব্য, AAOIFI Shari'ah Standard no ৬২:১৩-১ (draft)

আপত্তি (খ): শরীয়াহ বোর্ডে ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা থাকা

আমরা দেখেছি যে, সরকারের সুকুকের শরীয়াহ বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন ডেপুটি গভর্নর। আবার বাংলাদেশ ব্যাংকই ইস্যুয়ার। এভাবে একই প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা শরীয়াহ বোর্ডের কর্মকর্তা হওয়া সুকুকের শরীয়াহ বোর্ড এর স্বাধীন কার্যক্রমের স্বচ্ছতা পরিপন্থী।

আন্তর্জাতিক শরীয়াহ গভর্নেন্স নীতিমালা অনুযায়ী (যেমন AAOIFI GS ৫:৪ ও ১২:১৬-১৭): শরীয়াহ বোর্ডে এমন কোনো সদস্য থাকা উচিত নয়, যার ইস্যুকারী প্রতিষ্ঠানের (issuer) সাথে সরাসরি স্বার্থ-সম্পৃক্ততা (conflict of interest) রয়েছে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো – শরীয়াহ বোর্ডের সদস্যরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ও নিরপেক্ষভাবে শরীয়াহ মতামত দিতে পারেন।

আপত্তি (গ): একই ব্যক্তি ট্রাস্টি ও শরীয়াহ বোর্ড চেয়ারম্যান

একই ব্যক্তির হাতে ট্রাস্টি ও শরীয়াহ বোর্ডের নেতৃত্ব থাকা গভর্নেন্স নীতিমালার পরিপন্থী। এটি 'conflict of interest'-এর একটি ক্লাসিক উদাহরণ। এটি সুকুকের স্বচ্ছতা বিঘ্নিত করে। এতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব ও ধারনা করা স্বার্থের দ্বন্দ্ব (Presumed Conflict of Interest) দুটিই বিদ্যমান।

আপত্তি (ঘ): একই প্রতিষ্ঠানে ইস্যুয়ার, ট্রাস্টি ও শরীয়াহ অ্যাডভাইজর

এই ধরনের 'one roof structure' (একই ছাদের নিচে সকল দায়িত্ব) শরীয়াহ গভর্ণেন্সের মৌলিক নীতির পরিপন্থী। এটি AAOIFI-এর Sukuk Governance Standard (GS ৫:৪)-এর পরিস্কার লঙ্ঘন।

আপত্তি (ঙ): নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের শরীয়াহ বোর্ডে অবস্থান

বাংলাদেশ ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের শরীয়াহ বোর্ডে থাকা শরীয়াহ মতামতের নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ন করতে পারে। এতে করে শরীয়াহ বোর্ডের সিদ্ধান্ত ইস্যুকারীর পক্ষেই প্রবণ

হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।

সমাধান ও প্রস্তাবনা: সরকারি সুকুকের শরীয়াহ পর্যালোচনার জন্য দুইস্তরবিশিষ্ট শরীয়াহ বোর্ড কাঠামো প্রণয়ন।

প্রথম স্তর: বাংলাদেশ ব্যাংকের এর উদ্যোগে একটি 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ অ্যাডভাইজরী কাউন্সিল' (CSAC) গঠন করা। তাতে আধুনিক ইসলামী ফাইন্যান্স, ফিকহ ও সুকুক বিষয়ে বিজ্ঞ প্রবীণ ও নবীন মুফতি ও ফকীহগণ থাকবেন। এর প্রধানও হবেন বিজ্ঞ ফকীহ। উক্ত কাউন্সিল এর শরীয়াহ বিষয়ক মতামত ও সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। একে কোনোভাবেই প্রভাবিত করা যাবে না।

উক্ত কেন্দ্রীয় কাউন্সিল থেকে সুকুক বিষয়ক শরীয়াহ মতামত প্রদান করা হবে। এর আলোকে সরকারী সুকুকের শরীয়াহ কাঠামো চূড়ান্ত হবে।

দ্বিতীয় স্তর: স্বতন্ত্র ফতোয়া বিভাগ কর্তৃক পুন:শরীয়াহ পর্যালোচনা (Independent External Fatwa Review)

কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সুকুকের শরীয়াহ কাঠামো ও নীতিমালা অনুমোদন করার পর, সেটির শরীয়াহ বিষয়ে বহিরাগত পর্যালোচনা ও মতামত গ্রহণ করা হবে দেশের স্বীকৃত ২ টি ফতোয়া বিভাগ থেকে। তাদের মতামত সুকুকের শরীয়াহ স্বচ্ছতার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে বিবেচতি হবে। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করবে কেন্দ্রীয় শরীয়াহ কাউন্সিল।

এভাবে দ্বৈত যাচাই ও ভারসাম্যমূলক পর্যালোচনার মাধ্যমে সুকুকের শরীয়াহ স্বচ্ছতা অধিক নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। উপরোক্ত দুটি ধাপে সুকুকের শরীয়াহ মূল্যায়ন সমাপ্তির পর অধিকাংশের মতামতের ভিত্তিতে সুকুক প্রসপেক্টাস ইস্যু হবে। প্রস্তাবিত শরীয়াহ বোর্ড কাঠামো অনুযায়ী সুকুকের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো যেমন হবে:

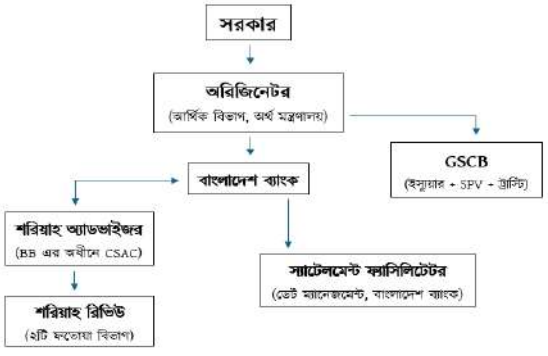

- সরকারের অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক বিভাগ অরিজিনেটর হবে।
- ইস্যুয়ার হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা হবে অর্থমন্ত্রণালয়ের ১০০% সাবসিডিয়ারি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান Government Sukuk Company of Bangladesh-GSCB (প্রস্তাবিত নাম)। যারা একই সঙ্গে SPV এবং ট্রাস্টির দায়িত্বও পালন করবে।
- বাংলাদেশ ব্যাংক হবে স্যাটেলমেন্ট ফ্যাসিলিটেটর।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের অধীনে প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল শরীয়াহ অ্যাডভাইজরী কাউন্সিল'-CSAC (প্রস্তাবিত নাম)-কে শরীয়াহ অ্যাডভাইজর নিয়োগ দেয়া হবে।
- সর্বশেষ দেশের গ্রহণযোগ্য ২টি ফতোয়া বিভাগ দ্বারা শরীয়াহ রিভিউ করানো হবে।

৩. বহি:শরীয়াহ নিরিক্ষণ ও রিভিউ ব্যবস্থার উন্নয়ন

সুকুক ইস্যু কার্যক্রমকে স্বচ্ছতর করার জন্য পুরো কার্যক্রমকে বছরে অন্তত একবার স্বাধীন বহি:শরীয়াহ কনসালটেন্সি ফার্ম দ্বারা শরীয়াহ রিভিউ বা অডিট করানো প্রয়োজন। যা বর্তমান সুকুক ব্যবস্থাপনায় অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে AAOIFI Governance Standard (GS) ১২, Sukuk Governance, Principles of governance, principle no: ৫ দ্রষ্টব্য।

সমাধান ও প্রস্তাবনা

সুকুক ইস্যুর সামগ্রিক কার্যক্রম স্বতন্ত্র শরীয়াহ কনসালটেন্সি ফার্ম দ্বারা শরীয়াহ রিভিউ/অডিট করানো যেতে পারে। পাশাপাশি শরীয়াহ রেটিংও করানো যেতে পারে।

শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাবলি এবং তার সমাধান ও প্রস্তাবনা

১. আর্থিক গ্যারান্টি কাঠামো উন্নয়ন

৬ষ্ঠ সরকারী সুকুক প্রসপেক্টাসে সরকারের ইস্যুকৃত পূর্বের সুকুকসমূহের ন্যায় অপারেশনাল (Operational Guarantee) এর পাশাপাশি সার্বিক আর্থিক (Financial Guarantee) এর কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। যা শরীয়াহ দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তিকর। যদিও কাগজে-কলমে বলা হয়েছে যে, আর্থিক গ্যারান্টার হচ্ছে-টিডিএমডব্লিউ (Treasury and Debt Management Wing), কিন্তু বাস্তবে গ্যারান্টার অর্থমন্ত্রণালয়ের আর্থিক-বিভাগই। কারণ ট্রেজারি বিভাগ-ই আর্থিক বিভাগের প্রধান বিভাগ।

এ ধরনের গ্যারান্টির মাধ্যমে সুকুকহোল্ডারগণ তাদের বিনিয়োগকৃত মূলধন, নিয়মিত রিটার্ন ও মুনাফার শতভাগ গ্যারান্টি পেয়ে থাকে। যার ফলে সুকুক ও বন্ডের মাঝে বাস্তবতার বিচারে বিশেষ কোন তফাৎ থাকে না।

এক্ষেত্রে সুকুক গভর্নেন্সের নিয়ম হল, সুকুকের আর্থিক গ্যারান্টর (যদি দিতে হয়) সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হতে হবে। ওরিজিনেটরের সাথে তার কোনও সম্পর্ক থাকতে পারবে না। ওরিজিনেটরের এমন কোনও সিস্টার কনসার্ন/সাবসিডিয়ারিও হতে পারবে না, যার ৫০% বা এর অধিক মালিকানা অরিজিনেটর ভোগ করে। এর উদ্দেশ্য হলো সুকুকের আর্থিক গ্যারান্টিকে রিবামুক্ত রাখা। যদি ওরিজিনেটর নিজেই বা তার অধীনস্ত কেউ উক্ত গ্যারান্টি প্রদান করে, তাহলে সেটি কার্যত সুদী লেনদেনে পরিণত হয়ে যায়। তখন বিষয়টি দাঁড়ায় এমন-ওরিজিনেটর ১০০ টাকা সুকুক হোল্ডার থেকে গ্রহণের বিপরীতে ১১০ টাকা ফেরৎ দেয়ার গ্যারান্টি প্রদান করছে। যা সম্পূর্ণ সুদী লেনদেন। তাই সুকুক গভর্নেন্স হল-সুকুক এর আর্থিক গ্যারান্টর এমন কোন পক্ষ থেকে হতে

হবে, যার সাথে অরিজিনেটরের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট নয়। এ প্রসঙ্গে কিছু রেফারেন্স তুলে ধরা হল-

সুকুক আর্থিক গ্যারান্টি ৩য় পক্ষ কর্তৃক হতে হবে। দ্রষ্টব্য: শারীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড ৫৬, ধারা: ৪/১/১।

সম্পদ ধ্বংস হওয়ার আগে অরিজিনেটর কর্তৃক সম্পদ প্রাপ্তি ও মূলধন রিটার্নের আইনগত কোন গ্যারান্টি দিতে পারবে না। সুকুক শারীয়াহ স্টান্ডার্ড: ৬২ (ড্রাফট) ধারা: ৬-২-১-২-b।

এ ধরনের প্রিন্সিপল এমাউন্টের গ্যারান্টি কার্যত capital guarantee" বা "debt guarantee", যা মূলত রিবা। যেমনটা অ্যাওফি শরীয়াহ স্ট্যান্ডার্ড, ১৭, ধারা নং ৫/১/৮/৭ তে বলা হয়েছে।

সরকার কেন সুকুকে আর্থিক গ্যারান্টি প্রদান করছে?

সরকারের পক্ষ থেকে সুকুকে আর্থিক গ্যারান্টি প্রদানের মূল কারণ হলো— "সরকারি ঋণ আইন, ২০২২"। এই আইনটি মূলত সরকারের ঋণগ্রহণ ও পরিশোধ সংক্রান্ত একটি সাধারণ আইন, যা সনাতনী অর্থ ব্যবস্থায় প্রচলিত সুদভিত্তিক বন্ড ও ট্রেজারি বিল ইস্যুর নিয়ম-কানুন নিয়ে প্রণীত। প্রসঙ্গক্রমে এতে সুকুক অন্তভুক্ত করা হয়েছে।

এই আইনের ধারা ও উপধারায় সরকারই গ্যারান্টর (জামিনদার) হিসেবে বিবেচিত — অর্থাৎ সরকার যেহেতু নিজেই ঋণগ্রহীতা, তাই সুদী বন্ডের মতো সরকারের দায়ও সরকারকেই বহন করতে হয়।

সমাধান ও প্রস্তাবনা:

১. স্বতন্ত্র সুকুক বিধি প্রণয়ন: সরকারের শরীয়াহভিত্তিক সুকুক ইস্যুর জন্য একটি স্বতন্ত্র বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক, যা সম্পূর্ণরূপে শরীয়াহ মানদণ্ড ও আন্তর্জাতিক সুকুক স্ট্যান্ডার্ড (যেমন AAOIFI Sukuk Standards) অনুসরণ করে রচিত হবে। যেমন, পাকিস্তানে "Ijara Sukuk Rules, ২০০৮" নামে আলাদা একটি বিধি রয়েছে, যেখানে শরীয়াহর মৌল নীতিগুলোর ভিত্তিতে সরকারি সুকুক পরিচালনা করা হয়।

স্বতন্ত্র সুকুক বিধি প্রণয়নের পূর্ব পর্যন্ত Bangladesh Securities and Exchange Commission (BSEC) কর্তৃক প্রণীত (Investment Sukuk) Rules, ২০১৯ অনুসরণ করা যেতে পারে।

২. সরকারি ঋণ আইন, ২০২২-এর আওতায় সুকুক ইস্যু বন্ধ করা: বর্তমান সরকারি ঋণ আইন, ২০২২ মূলত সুদী বন্ড ও ঋণ ব্যবস্থাপনার জন্য প্রণীত। সুকুক যেহেতু শরীয়াহসম্মত বিনিয়োগ ব্যবস্থা এবং কোনো ঋণ নয়, তাই এ আইনের অধীনে সুকুক ইস্যু করা অনুপযুক্ত এবং শরীয়াহ-পরিপন্থী। এ ব্যবস্থার অধীনে ইস্যু বন্ধ করা প্রয়োজন।

৩. সুকুকের গ্যারান্টি হিসাবে পাঁচ স্তরবিশিষ্ট গ্যারান্টি কাঠামো প্রণয়ন করা:

(১) নির্মাণ পর্যায়ের দায়িত্ব: সুকুক সম্পদের নির্মাণ পর্যায়ে মেনুফেকচারার বা প্রস্তুতকারক হিসাবে সকল দায়িত্ব বহন করবে এলজিইডি (LGED)।

(২) সার্ভিসিং, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ: নির্মাণ শেষে একটি যথাযথ সার্ভিসিং এজেন্ট চুক্তির আওতায় সুকুক সম্পদের মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে এলজিইডি (LGED)।

(৩) ভাড়ার অর্থপ্রদানের গ্যারান্টি: সুকুক সম্পদ ব্যবহার শুরু হওয়ার পর, সময়মতো ও পূর্ণ ভাড়ার অর্থপ্রদানের নিশ্চয়তার জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করবে টিডিএমডব্লিউ (TDMW)।

(৪) সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার অবস্থা থেকে রক্ষার জন্য: সুকুক সম্পদের আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হলে সুকুকধারীদের যেনো কোনো আর্থিক ক্ষতি না হয় তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে অরিজিনেটর (Originator) পূর্বেই অঙ্গীকার করবে যে তিনি সম্পদগুলো ক্রয় করে নিবেন।

(৫) তৃতীয় পক্ষের ক্রেডিট গ্যারান্টি: সর্বোপরি, একটি সর্বব্যাপী নিশ্চয়তা হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্রেডিট গ্যারান্টি ডিপার্টমেন্ট (CGD) তৃতীয় পক্ষের গ্যারান্টর হিসেবে কাজ করবে, যাতে মেয়াদপূর্তিতে সুকুকধারীদের বিনিয়োগ পূর্ণাঙ্গভাবে পরিশোধিত হয়। এটি কোন অবস্থাতেই অরিজিনেটর বা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন প্রতিষ্ঠান হতে পারবে না।

২. সুকুকের শরীয়াহ চুক্তির কাঠামোগত উন্নয়ন

৬ষ্ঠ সুকুকসহ বাংলাদেশ সরকারের ইস্যুকৃত বিগত কয়েকটি সুকুকের শরীয়াহ কাঠামো হলো ইসতিসনা ও ইজারা যৌথ ভিত্তিক। যা মূলত Asset-based Sukuk, যেখানে:

- Sukuk Holders কেবল beneficial owner হিসেবে বিবেচিত হয়;

- কিন্তু প্রকৃত মালিকানা তথা legal ownership রাষ্ট্রের কাছেই থাকে।

এ ধরনের কাঠামোতে প্রকৃত মালিকানার অনুপস্থিতিতে সুকুক কার্যত সুদী বন্ডের বিকল্প রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কারণে অনেক শরীয়াহ স্কলারগণ এই মডেলকে "interest-based structure with Islamic wrapping" বলে অভিহিত করেছেন।

বস্তুত এ ধরনের সুকুক কাঠামো আদর্শিক সুকুক কাঠামো নয়। বরং এধরনের কাঠামোর মাধ্যমে সুকুকটি আক্ষরিক অর্থে রিবার হীলা বা কৌশলী লেনদেনে রূপান্তর হয়ে যায়।

সমাধান ও প্রস্তাবনা: বিদ্যমান সুকুক কাঠামোকে পরিপূর্ণ শরীয়াহ বান্ধব এবং আদর্শিক পদ্ধতিতে গঠন করার জন্য পার্টিসিপেটরি তথা মুশারাকা সুকুক গঠন করা যেতে পারে। যা শরীয়াহ দৃষ্টিতে অধিকতর আদর্শিক (ideal) ও প্রকৃত অংশীদারিত্বমূলক (participatory) বিনিয়োগ মডেল। যেখানে সম্পদের নিছক beneficial ownership স্থানান্তর হবে না, বরং মূল মালিকানা (legal ownership) স্থানান্তর হবে। মুশারাকা সুকুক হলো, অরিজিনেটর ও সুকুকহোল্ডারগণ যৌথভাবে বিনিয়োগ করা। অরিজিনেটর একটি একপক্ষীয় ওয়াদা প্রদান করবে যে, ভবিষ্যতে নির্ধাতির মেয়াদ শেষে তারা সুকুক অ্যাসেটে বিনিয়োগকারীদের অংশটি বাজার মূল্যে ক্রয় করে নিবে। এরপর সুকুক অ্যাসেট তৈরি ও মুনাফা সৃষ্টি করার কাজ সরাসরি সরকার পক্ষ আঞ্জাম দিবে।

মুশারাকা সুকুকের বৈশিষ্ট্য:

১. Joint Ownership: সুকুক হোল্ডার এবং অরিজিনেটর (সরকার) যৌথভাবে মূলধন প্রদান করে এবং সম্পদের legal ownership উভয়ের মাঝে অংশীদারিভিত্তিতে ভাগ হয়।

২. অপারেশনাল সুবিধা: অরিজিনেটর একদিকে যেমন পার্টনার, অপরদিকে এজেন্ট হিসেবেও কাজ করতে পারে। এজন্য আলাদা করে তৃতীয় পক্ষকে সম্পদ তৈরির জন্য ওকিল নিয়োগ এবং গ্যারান্টি প্রদানের প্রয়োজন পড়ে না। দীর্ঘসূত্রতা থেকে বাঁচা যায়। মুশারাকার শরীয়াহ নীতি অনুযায়ী অরিজিনেটর যেমনিভাবে সুকুকহোল্ডারদের পার্টনার, আবার একই সাথে এজেন্ট। অতএব এজেন্ট হিসাবে অরিজিনেটর নিজেই সুকুক এসেট তৈরি ও নির্মাণ করতে সক্ষম। নির্মাণ সম্পন্ন হলে তাতে মুশারাকা চুক্তির পার্সেন্ট অনুযায়ী অরিজিনেটর এবং সুকুকহোল্ডারগণ উভয়ে যৌথভাবে সুকুক সম্পদের মালিক বলে বিবেচিত হবে।

৩. Real Ownership ও Risk Sharing: প্রকৃত মালিকানার পাশাপাশি লাভ ও ক্ষতির যৌথ ভাগাভাগি নিশ্চিত হয়—যা শরীয়াহ সম্মততার অন্যতম মূল ভিত্তি।

৪. Exit Mechanism: মেয়াদ শেষে অরিজিনেটর একতরফা ওয়াদা (binding unilateral promise) এর মাধ্যমে সুকুক হোল্ডারদের অংশ বাজার মূল্যে কিনে নিতে পারে, যা শরীয়াহ ও কমার্শিয়াল বাস্তবতায় গ্রহণযোগ্য।

৫. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা: Joint ownership ও profit-sharing model স্বচ্ছতা বাড়ায় এবং প্রকল্পের কার্যকারিতা ও মুনাফার প্রকৃত পরিমাপ করতে উৎসাহিত করে।

আন্তর্জাতিক উদাহরণ: UAE এবং মালয়েশিয়ার কিছু প্রকল্পে participatory Sukuk যেমন মুদারাবা ও মুশারাকা সাফল্যের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে, যা প্রকৃত অর্থে শরীয়াহভিত্তিক উন্নয়ন অর্থায়ন নিশ্চিত করেছে।

সারকথা:

উপরোক্ত পর্যালোচনা থেকে এটি প্রতীয়মান হয় যে, বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যমান সুকুক কাঠামো আন্তর্জাতিক সুকুক গভর্নেন্স এবং শরীয়াহ নীতিমালা উভয় বিবেচনায় বিভিন্ন দুর্বলতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতির শিকার। এমতাবস্থায় হালাল অনুযায়ী চলতে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের জন্য উক্ত সুকুক শরীয়াহ বিবেচনায় নিরাপদ নয়। বিশেষত ইসলামী ব্যাংকসমূহ, যারা তাদের গ্রাহক, শেয়ার হোল্ডারদের কাছে শরীয়াহ সম্মত মুনাফা প্রদানে প্রতিশ্রুতবদ্ধ, তাদের জন্য হালাল-হারামের বিবেচনায় এটি ঝুঁকিপূর্ণ। এ ঝুঁকির পেছনে সবচেয়ে বড় কারণ 'গ্যারান্টি' ইস্যু যা পূর্বে বিশদাকারে আলোচনা করা হয়েছে। এই ইস্যুসহ অন্যান্য যে সকল শরীয়াহ উন্নয়ন প্রস্তাবনা প্রদান করা হয়েছে, তার সংশোধন ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যমান সুকুক আরো অধিক শরীয়াহ বান্ধব হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা আশা করবো, কেন্দ্রীয় ব্যাংক উক্ত প্রস্তাবনাসমূহকে আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করবেন এবং তা বাস্তবায়নে দ্রুত উদ্যোগী হবেন।

বাই নাউ পে লেটার (BNPL): পরিচিতি ও শরিয়াহ বিধান

মুফতী সাজ্জাদুর রহমান

'বাই নাউ পে লেটার', আরবীতে বলে- الشراء الآن والبيع لاحقًا। এর প্রয়োগ আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ব্যাপকভাবে শুরু না হলেও বহির্বিশ্বে এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বেড়েই চলছে। ইউরোপ, আমেরিকা এমনকি এশিয়াতেও ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে এর ব্যবহার। পিছিয়ে নেই মুসলিম দেশগুলো; সৌদি আরব, দুবাই, মালয়েশিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলিম দেশেও ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে এর ব্যবহার। আমাদের দেশে সিটি ব্যাংক ও বিকাশ মিলে চালু করেছে বিকাশ অ্যাপে "পে-লেটার" অপশন।

২৪ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ (গ্লোব নিউজওয়াইর) প্রকাশিত একটি জরিপে উঠে এসেছে, বিশ্বব্যাপী BNPL পেমেন্ট বাজার বার্ষিক ভিত্তিতে ১৩.৭% বৃদ্ধি পেয়ে ৫৬০.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছাবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২১-২০২৪ সালে বিশ্বব্যাপী BNPL বাজার শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে, যা ২১.৭% Compound Annual Growth Rate (CAGR) অর্জন করেছে। এই ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে। ২০২৫-২০৩০ সালে বাজার ১০.২% CAGR-এ বৃদ্ধি পাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের শেষ নাগাদ, BNPL খাতের ২০২৪ সালের মূল্য ৪৯২.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার থেকে আনুমানিক ৯১১.৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে সম্প্রসারণের সম্ভাবনা রয়েছে।

গবেষণায় দেখা গিয়েছে এ লেনদেনটি মৌলিকভাবে বৈধ হলেও এর কিছু ক্ষেত্রে রয়েছে সুদের মিশ্রণ। তাই এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার বিকল্প নেই।

বাই নাউ পে লেটার: প্রাথমিক পরিচিতি

'বাই নাউ পে লেটার': এটি এমন একটি স্বল্প মেয়াদি ক্রেডিট সুবিধা যা BNPL (অন্য অর্থে মার্চেন্ট) গ্রাহক/ক্রেতাকে প্রদান করে। যার মাধ্যমে ক্রেতা পণ্যের মূল্য নগদে আদায় করার পরিবর্তে বাকিতে একমুঠে বা কিস্তিতে পরিশোধ করার সুবিধা পেয়ে থাকে। কোন কোন সময় বিলম্বে পরিশোধ করার কারণে সুদ প্রদান করতে হয় না।

এখানে বিভিন্ন প্রশ্ন মনে উদয় হতে পারে। যেমন, মার্চেন্ট কেন ক্রেতাকে সুদ ছাড়া কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার সুযোগ দিবে? তার লাভ কি? উত্তর সহজ। এখানে মূলত মার্চেন্ট পূর্ণ মূল্য নগদেই পেয়ে যায়। তৃতীয় পক্ষ টাকা পরিশোধ করে দেয় বিনা সুদে (কোন কোন ক্ষেত্রে)। সুতরাং মার্চেন্টের কোন ক্ষতি নেই।

আবার প্রশ্ন হতে পারে, তৃতীয় পক্ষ সে কেন লাভ ছাড়া ঋণ দিবে। পুঁজিবাদি বাজারে এমন মহাজনের আবির্ভাব হল কোথা থেকে? খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, ৩য় পক্ষ মূলত সুদ ছাড়া ঋণ প্রদান করে। তারা মার্চেন্ট থেকে কমিশন নিয়ে থাকে। নির্ধারিত সময়ে ক্রেতা উক্ত ঋণ তাদের কাছে বিনা সুদে পরিশোধ করে দেয়। এই ৩য় পক্ষই হল BNPL।

সুতরাং আমরা সহজে বলতে পারি। বাই নাউ পে লেটার হল:

- এটি একটি স্বল্প মেয়াদি ক্রেডিট সুবিধা যা BNPL তার গ্রাহককে প্রদান করে।
- গ্রাহককে পূর্ণ টাকা নির্ধারিত সময়ে বা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়।
- এই ঋণ প্রদানের কারণে গ্রাহক থেকে কোন সুদ নেয়া হয় না। (নন ইসলামী কোম্পানিগুলো সুদ নিয়ে থাকে)
- পূর্ণ কাজটি BNPL এ্যাপসের মাধ্যমে করে থাকে।

BNPL কিভাবে কাজ করে?

- মনে করুন, আপনি একটি লেপটপ কিনতে চাচ্ছেন। শপে গিয়ে তা পছন্দ করলেন। তারপর চেকআউটে গেলেন।

- চেকআউটে আপনি অর্থপ্রদানের বিভিন্ন অপশন দেখতে পাবেন। BNPL নামে একটি অপশন থাকবে। সেখানে ক্লিক করতে হবে।

- BNPL কর্তৃপক্ষ গ্রাহকের উপর ক্রেডিট চেক চালাবে। BNPL নির্বাচন করার সময় গ্রাহককে ব্যক্তিগত বিবরণ প্রদান

করতে হবে। যদি গ্রাহকের ক্রেডিট ইতিহাস ভাল হয় তাহলে BNPL তাকে ঋণ প্রদানে সম্মত হবে।

- অনুমোদিত হলে, আপনাকে সামগ্রিক ক্রয়ের একটি এমাউন্ট প্রদান করতে হবে। এছাড়াও খুচরা বিক্রেতার পক্ষ থেকে একটি লেনদেন ফি নেয়া হয়। এটি সাধারণত ২-৮% এর মধ্যে থাকে। যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে BNPL ব্যবসায়ীকে যে পরিমাণ অর্থ প্রদান করে তা থেকে কেটে নেয়া হয়।

- এখন, আপনি পূর্ণমূল্য পরিশোধ না করেই লেপটপ পেয়ে গেলেন। আপনি এখন বাকিতে একমুঠে বা কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করতে পারবেন। পেমেন্ট চেক, ব্যাংক ট্রান্সফার, ক্রেডিট কার্ড বা ডেবিট কার্ডের মাধ্যমেও পরিশোধ করা যাবে।

- সাধারণত, উক্ত ঋণ (ইসলামী কোম্পানিগুলোতে) সুদ মুক্ত। কিন্তু গ্রাহক যদি সময়মত পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে তাকে সুদ প্রদান করতে হয়। অধিকিন্তু, অর্থ প্রদানে বিলম্ব করার কারণে ভবিষ্যত ঋণের স্কোরকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

ক্রেডিট কার্ড ও বাই নাউ পে লেটারের মাঝে পার্থক্য:

ক্রেডিট কার্ড	বাই নাউ পে লেটার (BNPL)
এখানে কিছু গোপন চার্জ থাকে।	এখানেও এমন কিছু আছে। বাকি খরচ কম। লেনদেনে স্বচ্ছতার বিষয়টি অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়।
ঋণ পেতে হলে অবশ্যই ভালো ক্রেডিট স্কোর থাকতে হবে।	BNPL-এ ভালো ক্রেডিট স্কোর বাধ্যতামূলক নয়।
ক্রেডিট কার্ড ব্যাপকভাবে গৃহিত ও ব্যবহৃত হয়।	BNPL এখনো ক্রেডিট কার্ডের মত তেমন ব্যাপক হয়নি।
ঋণের অনুমোদন এখানে একটু কঠিন।	তুলনামূলক সহজ।

BNPL কিভাবে আয় করে?

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হতে পারে যে, BNPL কিভাবে আয় করে ও কোন কোন সোর্স থেকে আসে?

তাদের রেভিনিউটা কয়েকভাবে আসে। যেমন-

কমিশন গ্রহণ:

মার্চেন্টদের কাছ থেকে কমিশন গ্রহণের মাধ্যমে। BNPL এর কারণে মার্চেন্ট মূলত এমন কিছু কাস্টমার পেয়ে যাচ্ছে, যারা BNPL না থাকলে হয়ত আসত না। কারণ তাদের কাছে তো টাকা নেই। BNPL এর উপর ভরসা করেই তো তারা শপে এসেছে। সুতরাং মার্চেন্টের/বিক্রেতার কাছ থেকে BNPL সাধারণত ২-৮% (লিমিটভেদে) কমিশন নিয়ে থাকে।

সুদ আরোপ:

নন ইসলামী কোম্পানীগুলো গ্রাহকদের থেকে ঋণ প্রদান বাবদ সুদ নেয়। ইন্ডিয়াতে এই বিজনেজ ভালো জমে উঠেছে। সেখানে BNPL এর অনেক কোম্পানি রয়েছে। যেমন- Mobikwik, Flipkart, Zest Money, Simpl, Paypal, Lazy Pay, Amazon Postpaid, Paytm Postpaid। সুদ সাধারণত ক্রেডিট লিমিট ভেদে ১০ - ৩০% পর্যন্ত হয়ে থাকে। প্রসঙ্গত, অনেক কোম্পানীতে মিনিমাম ডিউ থাকে। উক্ত সময়ের মাঝে টাকা পরিশোধ করতে পারলে কোন সুদ দিতে হয় না।

বিলম্ব মাশুল আরোপ:

কিস্তির নির্ধারিত সময়ে মূল্য পরিশোধ না করতে পারলে বিলম্ব মাশুল (সুদ) নেয়া হয়ে থাকে। মূলত কোম্পানিগুলো অনেক রেভিনিউ এই ক্ষেত্র থেকে আসে।

সেল প্লাটফর্মের মাধ্যমে আয়:

নিজস্ব অনলাইন প্লাটফর্র তৈরি করার মাধ্যমে তারা তাদের রাজস্ব যোগ করে কার্ড সোয়াইপ করার ফ্রিকোয়েন্সি বাড়াতে সক্ষম। তারা গ্রাহকদের তা প্রদানের জন্য তাদের ব্যবসায়িক অংশীদারদের কাছ থেকে একটি কমিশন ফি নিয়ে থাকে ।

বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আয়:

আয়ের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উৎস হল বিজ্ঞাপন। বিক্রয় বৃদ্ধির লক্ষে বিভিন্ন ব্র্যান্ড বিজ্ঞাপনের জন্য তাদের সাথে যোগাযোগ করে। এই ব্র্যান্ডগুলি তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য BNPL -কে অর্থ প্রদান করে।

বাই নাউ পে লেটার: শরয়ী বিধান

প্রচলিত লেনদেন হিসাবে আমরা এটিকে দু'ভাগে ভাগ

করতে পারি। এক. বাকিতে লেনদেন। যদি ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে পূর্ণমূল্য পরিশোধ করার চুক্তি থাকে। দুই. কিস্তিতে লেনদেন। যদি নির্ধারিত সময়ে কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করার চুক্তি থাকে। বলাবাহুল্য উক্ত দু'ধরনের

লেনদেনই শর্তসাপেক্ষে মৌলিকভাবে বৈধ। নিম্নে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হল।

এক. বাকিতে লেনদেন। আরবীতে বলে البيع بالآجل। বাকিমূল্য নগদ মূল্যের থেকে বেশি হলেও লেনদেনটি নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে বৈধ:

- পণ্য ও মূল্য সুনির্দিষ্ট হওয়া।
- পরিশোধের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হওয়া।
- পণ্যটি বাকিতে লেনদেনের উপযুক্ত হওয়া। সুদীপণ্য (الأموال الربوية) না হওয়া।
- চুক্তিতে এরূপ শর্ত করা যাবে না যে, নির্ধারিত সময়ে দায় আদায়ে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করতে হবে। অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হলে মূল্যও বৃদ্ধি করতে হবে। যদিও পরবর্তীতে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে না হয়, তদুপরি চুক্তিটি যেহেতু সুদী চুক্তি, তাই তা করা যাবে না।

দুই. কিস্তিতে লেনদেন করা। এটিও নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে বৈধ:

- পণ্যের মূল্য ক্রয়-বিক্রয়ের মজলিসেই সুনির্দিষ্ট করে নেয়া।
- চুক্তিতে এরূপ শর্ত করা যাবে না যে, কোন কিস্তি আদায়ে ব্যর্থ হলে অতিরিক্ত মূল্য প্রদান করতে হবে। অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হলে মূল্যও বৃদ্ধি করতে হবে। যদিও পরবর্তীতে এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখিন হতে না হয়, তদুপরি চুক্তিটি যেহেতু সুদী চুক্তি তাই তা করা যাবে না।
- মূল্য আদায়ের সময় বা কিস্তি পরিশোধের সময় সুনির্দিষ্ট করে নেয়া।
- কত কিস্তিতে আদায় করা হবে, কিস্তির সংখ্যাও সুনির্দিষ্ট হওয়া।

যে কোন ধরনের পণ্য কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উক্ত ৪টি শর্ত পালন হচ্ছে কি না তা নিশ্চিত করা জরুরী। নতুবা লেনদেন শরীয়াহ পরিপন্থী হয়ে যাবে।

সুতরাং বুঝা গেল মৌলিকভাবে বাই নাউ পে লেটার বৈধ।

তবে প্রচলিত লেনদেনে কিছু সমস্যা ও শরীয়া বহির্ভূত বিষয় পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো ঠিক করা হলে লেনদেনটি সহীহ হয়ে যাবে। এখন আমরা সে সকল সমস্যাগুলো উল্লেখ করে সমাধান পেশ করব। আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র তাওফীকদাতা।

ঋণের উপর সুদ আরোপ:

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, BNPL গ্রাহককে ক্রেডিট লিমিট বা পরিশোধের মেয়াদ হিসাবে ১০-৩০% পর্যন্ত সুদ আরোপ করে থাকে। এটা স্পষ্ট সুদ। চুক্তি এ ধরনের শর্ত থেকে অবশ্যই মুক্ত থাকতে হবে।

বিকল্প: এর বিকল্প হল, করযে হাসানা বা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা। মার্চেন্ট থেকে কমিশন বা অন্যভাবে লাভ নেয়া যেতে পারে। সামনে বিস্তারিত আসছে।

বিকাশের "পে-লেটার" অ্যাপ: কিছু কথা

বিকাশের "পে-লেটার" অ্যাপ ব্যবহার করে পেমেন্ট করার সিস্টেম রয়েছে। তাদের ওয়েব সাইটে দেয়া আছে, ৭দিনে সম্পূর্ণ পরিশোধে কোন ইন্টারেস্ট নেই। প্রসেসিং ফি ০.৫৭৫% দিতে হবে। অন্যথায় ৩ মাসে কিস্তিতে পরিশোধ করুন, গ্রাহকভেদে ইন্টারেস্টের হার ভিন্ন হতে পারে। তবে যদি ৬টি কিস্তিতে পরিশোধ করে তাহলে সুদ দিতে হবে; যা গ্রাহক ভেদে ভিন্ন হতে পারে। এক্ষেত্রেও প্রসেসিং ফি ০.৫৭৫% দিতে হবে।

পর্যালোচনা:

'৭দিনে সম্পূর্ণ পরিশোধে কোন ইন্টারেস্ট নেই। অন্যথায় ৩ মাসে কিস্তিতে পরিশোধ করুন, গ্রাহকভেদে ইন্টারেস্টের হার ভিন্ন হতে পারে।'- থেকে বুঝে আসে মূল চুক্তিকে সুদের বিষয় রয়েছে। ৭ দিন একটি মিনিমাম ডিউ রাখা রয়েছে। পরিশোধ করতে না পারলে সুদ দিতে হবে। আর সুদের চুক্তি করা হারাম।

এটা ক্রেডিট কার্ডের মিনিমাম ডিউয়ের সাথে তুলনা করা যেতে পারে। আর ক্রেডিট কার্ডের বিধান হলো, মূল চুক্তিতে যেহেতু সুদ রয়েছে তাই মিনিমাম ডিউয়ে পরিশোধ করার নিয়ত থাকলেও তা ইস্যু করা বৈধ নয়।

সৌদি আরবের গবেষণা ও ফতোয়ার স্থায়ী বোর্ড Permanent Committee for Scholarly Research and Ifta তাদের এক ফতোয়ায় লিখেছেন- (প্রশ্ন ছিল, মিনিমাম ডিউ এর আগে বিল পরিশোধ করে দিলে কোন ফি নেই, আর না হয় অতিরিক্ত টাকা আদায় করতে হয়। এমন শর্তযুক্ত ক্রেডিট কার্ড কি নেয়া যাবে, যদিও নিয়ত থাকে যে,

মিনিমাম ডিউ এর আগেই বিল শোধ করা হবে?) 'বিষয়টি বাস্তবে এমনি হয়ে থাকলে সেটা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ গ্রাসের নামান্তর। এটি জাহেলী রিবা -যা শরীয়তে হারাম- এর অধীনে পড়ে যায়। জাহেলী রিবা হল, এখন আদায় কর। নতুবা অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে সময় নাও। সুতরাং এ ধরনের ক্রেডিট কার্ড ইস্যু করা বা ব্যবহার করা জায়েয নয়।

উক্ত ফতোয়ায় যারা সম্মতি প্রকাশ করেছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন: বকর আবু যায়েদ। আব্দুল আযীয আলে শাইখ, সালেহ ফাওযান, আব্দুল্লাহ ইবনে গাদইয়ান ও সংস্থাপ্রধান: আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায রহ.।

প্রসেসিং ফি

এখানে ব্যাংক গ্রাহককে ঋণ দিচ্ছে। ব্যাংক ও গ্রাহকের মাঝে ঋণের সম্পর্ক। ঋণের সম্পর্ক শারিয়াহর দৃষ্টিতে অত্যন্ত স্পর্শকাতর। ঋণদাতা ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণের বিনিময়ে কোন ধরনের উপকার নেয়া বৈধ নয়। সুতরাং প্রসেসিং ফি এর নামে ঋণগ্রহীতা থেকে কিছু গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকতে হবে, যেন তা সুদ গ্রহণ না হয়। এর জন্য যা করতে হবে তা হল-

- প্রসেসিং ফি ঋণের পরিমাণের সাথে যুক্ত হবে না। যেমন, এক লক্ষ টাকা লোন নিলে ফি ১০০০ টাকা। আর পঞ্চাশ হাজার টাকা লোনের ফি ৫০০ টাকা। বলাবাহুল্য এখানে তাই ঘটেছে। যা শতকরা হার থেকে বুঝে আসে। ফিক্সড ফি নির্ধারণ না করে ০.৫৭৫% নির্ধারণ করা হয়েছে।

- করজ প্রদান করতে যেয়ে এ্যাট এ্যাকচুয়াল (At actual) যে খরচ হয় কেবল সেটাই নেয়া যাবে। এর বেশি নয়।

- ঋণ প্রদান বাবদ খরচ নির্ণয়ের বিষয়টি অত্যন্ত সতর্কতার সহিত সূক্ষভাবে করতে হবে। যেন কোন অবস্থাতেই তা সুদ গ্রহণের দিকে না নিয়ে যায়।

- সুদ গ্রহণের অপকৌশল হিসাবে ফি-কে ব্যবহার না করা।

উপরোক্ত বিষয়গুলো স্বতস্বীকৃত। এ বিষয়ে কিছু আন্তর্জাতিক শারিয়াহ নির্দেশনা তুলে ধরা হল।

AAOIFI এর 'করজ' সংক্রান্ত ১৯ নং শারিয়াহ স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ১০/৩-এ বলা হয়েছে-

لا يجوز ربط الرسم بالمبلغ المسحوب، ولا يجوز للمؤسسة التحايل بوضع شرائح السحب من أجل تكرار الأجرة، كما لا يجوز مراعاة زمن السداد المبلغ المسحوب.

"প্রদত্ত ঋণের পরিমাণের সাথে ফি-কে সংযুক্ত করা বৈধ নয়। বিভিন্নমুখী ফি নেয়ার নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে ঋণের উপর অতিরিক্ত গ্রহণের কোন অপকৌশলের আশ্রয় নেয়া ব্যাংকের জন্য বৈধ নয়। তদ্রূপ প্রদত্ত ঋণ পরিশোধের মেয়াদের দিকে লক্ষ্য করেও ফি নির্ধারণ করা বৈধ নয়।"

উক্ত স্ট্যান্ডার্ডের ধারা ৯/১-এ বলা হয়েছে-

يجوز للمؤسسة المقرضة أن تأخذ على خدمات القروض ما يعادل مصروفاتها الفعلية المباشرة، ولا يجوز لها أخذ زيادة عليها، وكل زيادة على المصروفات الفعلية محرمة. ويجب أن تتوخى الدقة في تحديد المصروفات الفعلية بحيث لا يؤدي إلى زيادة تؤول إلى فائدة.

"ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য ঋণ প্রদান করতে বাস্তব ও সরাসরি যে খরচ হয়ে থাকে তা ঋণগ্রহীতা থেকে গ্রহণ করা বৈধ। এর অধিক নেয়া বৈধ হবে না। বাস্তব খরচের উপর যা কিছু অতিরিক্ত নেয়া হবে সবই হারাম। বাস্তব খরচ নির্ণয়ের জন্য সর্বোচ্চ সূক্ষভাবে হিসাব করতে হবে, যেন তা সুদ গ্রহণের দিকে না নিয়ে যায়।"

বিকল্প: এক্ষেত্রে সুদের শর্ত বাদ দিয়ে এট এ্যাকচুয়াল কস্ট ও মার্চেন্ট থেকে কমিশন নেয়া যেতে পারে। অন্যান্য যে আয়ের কথা এখানে শর্তসাপেক্ষে বলা হয়েছে তা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

এখানে আরেকটি বিষয়টি হলো, পাওনা আদায় নিশ্চিত করা। এর জন্য সদুমুক্ত বিভিন্ন বিকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। (সামনে উল্লেখ করা হয়েছে)

বিলম্ব মাশুল:

নির্ধারিত সময়ে ঋণ বা কিস্তি পরিশোধ করতে না পারলে মেয়াদান্তে সুদ নেয়া যাবে না। অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে কিছু BNPL বিলম্ব মাশুল নামে সুদ নিয়ে থাকে। এটা সর্বসম্মতিক্রমে সুদ; হারাম। এটাকে কুরআন স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছে।

বিকল্প: কিস্তির অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে যে, এখানে মূল বিষয়টি হলো, পাওনা আদায় নিশ্চিত করা। এর জন্য সদুমুক্ত বিভিন্ন বিকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা:

১. ক্রেতা থেকে পণ্য ব্যতীত অন্য কোনো মূল্যবান জিনিস বন্ধক হিসাবে গ্রহণ করা। তবে শর্ত হলো, বন্ধককৃত বস্তু বিক্রেতা ব্যবহার করতে পারবে না। কারণ, বন্ধকি বস্তু থেকে উপকৃত হওয়া রিবার অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া এটি বন্ধকের উদ্দেশ্যও নয়। বন্ধকের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকু যে, সময়মত দেনা পরিশোধ না হলে এর মাধ্যমে তা পরিশোধ করা হবে।

২. অথবা ক্রেতা পণ্য হস্তগত করার পর সেটাই পুনরায় বন্ধক হিসাবে দিতে পারে। বন্ধকের উভয় সূরতে ক্রেতা মূল্য পরিশোধ না করলে, বিক্রেতা বন্ধককৃত বস্তু বিক্রয় করে তার মূল্য উসূল করে নিতে পারবে। তবে অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে হবে। এরূপ শর্ত করা যেতে পারে যে, সর্বোচ্চ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে মূল্য পরিশোধ না করা হলে বন্ধককৃত বস্তু নিলামে উঠবে।

৩. অথবা শুরুতেই ক্রেতা থেকে এই প্রতিশ্রুতি নেওয়া হবে যে, যথাসময়ে মূল্য পরিশোধে বিলম্ব হলে, এই পরিমাণ টাকা বিক্রেতার বিশেষ ওয়েলফেয়ার (Welfare) ফান্ডে দান করতে বাধ্য থাকবে। এভাবে প্রতিশ্রুতি প্রদানের পর, কিস্তি ফেইল হলে পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্রেতা পূর্ব-ঘোষিত বিশেষ হারে অর্থ বিক্রেতার ওয়েলফেয়ার ফান্ডে দান করবে। এরপর বিক্রেতা সেটা সাদাকা করে দেবে। নিজের মুনাফা হিসেবে উক্ত দানকে গণ্য করা যাবে না। এর উপকারিতা কেবল এতটুকু যে, ক্রেতা যথাসময়ে মূল্য পরিশোধে অধিক যত্নবান থাকবে।

৪. অথবা তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে কাফিল বা গ্যারান্টর হিসাবে রাখা যেতে পারে। সে সময়মত কিস্তি আদায় না করলে তা পরিশোধের দায়িত্ব নেবে।

৫. অথবা চেক গ্রহণ করা হবে। যেগুলো নির্ধারিত সময়ে পরিপক্ক হবে।

মোটকথা, এভাবে সুদী পন্থা ছাড়াও বিভিন্ন ভাবে পাওনা আদায় নিশ্চিত করা সম্ভব।

নগদায়নের শর্তে ছাড় প্রদান চুক্তি (Cut off and pay now)

'নগদায়নের শর্তে ছাড় প্রদান' এর অর্থ হল-কাউকে ঋণ দিয়ে কিংবা কারো কাছে বাকিতে বা কিস্তিতে কিছু বিক্রয়ের পর ঋণদাতা বা বিক্রেতা এভাবে প্রস্তাব করা, যদি সময়ের আগে পরিশোধ করেন, তাহলে এই পরিমাণ রেয়াত করা হবে বা ছাড় দেয়া হবে।

এ বিষয়ে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, এটা যদি বাকি লেনদেনে শর্তসাপেক্ষে হয় তাহলে বৈধ নয়।

মার্চেন্ট থেকে কমিশন গ্রহণ করা:

অনুসন্ধানে দেখা গিয়েছে BNPL কোম্পানীগুলো মার্চেন্ট থেকে কমিশন নিয়ে থাকে। পণ্যের মূল্যের লিমিট হিসাবে এটি ২-৮% পর্যন্ত হয়ে থাকে। এটি বৈধ। কারণ, এটি মূলত দালালী বা দোকানে গ্রাহক/ক্রেতা নিয়ে আসার জন্য মজুরী গ্রহণ। তা এভাবে যে, BNPL এর কারণে মার্চেন্ট মূলত এমন কিছু কাস্টমার পেয়ে যাচ্ছে, যারা BNPL না থাকলে হয়ত আসত না। কারণ তাদের কাছে তো টাকা নেই। BNPL এর উপর ভরসা করেই তো তারা শপে আসছে। সুতরাং বিক্রেতার কাছ থেকে BNPL কমিশন নিয়ে থাকে।

বিজ্ঞাপন থেকে আয়:

BNPL এর এ্যাপ থেকে বিভিন্ন ব্রান্ডগুলো এড দিয়ে থাকে। এটি ইজারা বা মজুরী হিসাবে হতে পারে। তারা তাকে এড প্রচারের জন্য মজুরী দিচ্ছে। এটিও কিছু শর্ত সাপেক্ষে বৈধ।

- বিজ্ঞাপন সব ধরনের ধোঁকা, মিথ্যা ও প্রতারণা মুক্ত হতে হবে। কারণ, এগুলো শরীয়তে বৈধ নয়।
- বিজ্ঞাপনগুলোতে কোন নিষিদ্ধ বিষয় না থাকা। যেমন, মেয়েদের ছবি, নগ্নতার প্রচার ইত্যাদি।
- কোন হারাম বিষয়ের বিজ্ঞাপন না হওয়া। যেমন, মদ, শুকরের গোশত বিক্রি ইত্যাদি।
- বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে কোন গোনাহের কাজে সহযোগিতা না হওয়া।

উপরোক্ত বিষয়গুলো না পাওয়া গেলে বিজ্ঞাপন থেকে আয় করাতে কোন সমস্যা নেই।

সারকথা: BNPL মৌলিকভাবে বৈধ। নিষিদ্ধ বিষয়গুলো না থাকলে এর প্রয়োগ হতে পারে।

লেখক: মুফতি সাজ্জাদুর রহমান (CSAA), সহকারি মুফতি, জামিয়া বিন্নুরিয়া মারকাযুশ শরইয়্যাহ মিরপুর, ঢাকা

ইসলামে ঋণের রীতিনীতি ও বর্তমান পরিস্থিতি

মাওলানা আহসানুল ইসলাম

ভূমিকা

ঋণ ইসলামের 'মুআ'মাল' তথা লেনদেন সংক্রান্ত একটি বিধান। যার পরিধি ইসলামের অন্যান্য বিধানের মত ব্যাপক ও বিস্তৃত নয়। সীমিত পরিসরে এই বিধানের বাস্তবায়ন হয়ে থাকে। যেমন, সমাজের কোন ব্যক্তি যখন বাস্তব অভাবের মুখোমুখি হয়ে ঋণ গ্রহণের সম্মুখীন হয়, তখন সমাজের ঋণ প্রদানের সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাকে ঋণ দিয়ে এই বিধানটি কার্যকর করে।

কুরআনের দৃষ্টিতে ঋণ

আল্লাহ তাআলা ঋণের ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার ও স্বচ্ছতার নির্দেশ দিয়েছেন—

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

অর্থ: "হে মুমিনগণ! যখন তোমরা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণ লেনদেন কর, তখন তা লিখে রাখো।" (সূরা বাকারা, সূরা নং: ০২, আয়াত নং: ২৮২)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, ঋণ গ্রহণ বৈধ; তবে তা হতে হবে প্রয়োজনীয়, ন্যায়সঙ্গত ও স্বচ্ছ লেনদেনের ভিত্তিতে।

কুরআনের দৃষ্টিতে ঋণ প্রদানের ফযিলত

স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ঋণ প্রদানে উৎসাহ দিয়ে এরশাদ করেন —

"যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তোমাদের জন্য তা বহু গুণ বৃদ্ধি করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, ধৈর্যশীল।"

﴿ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴾

(সূরা আত-তাগাবুন, আয়াত: ১৭)

অন্যত্র তিনি বলেন —

"কে সে, যে আল্লাহকে করযে হাসানা প্রদান করবে ফলে তিনি তার জন্য তা বহু গুণে বৃদ্ধি করবেন।"

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ ﴾

(সূরা আল-বাকারা, আয়াত: ২৪৫)

হাদীসে ঋণ প্রদানের উৎসাহ

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঋণ প্রদান ও অভাবীদের সহায়তার গুরুত্ব সম্পর্কে বলেন —

"যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের দুনিয়াবী বিপদ দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা তার আখেরাতের বিপদ দূর করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো অভাবীর কষ্ট সহজ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ করবেন। আল্লাহ বান্দার সাহায্য করেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্য করে।"

مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا، نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ২৬৯৯)

সুতরাং, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ ঋণ প্রদানে উৎসাহ দিয়েছেন—কিন্তু তা শুধু বাস্তব অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

হাদীসে ঋণ গ্রহণের ব্যাপারে সতর্কতা

১. ঋণ পরিশোধের আন্তরিক ইচ্ছা

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا، أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَافَهَا، أَتْلَفَهُ اللَّهُ

অর্থ: "যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ (ঋণ) নেয় তা পরিশোধের ইচ্ছা নিয়ে, আল্লাহ তার হয়ে তা পরিশোধ করে দেন। আর যে তা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে নেয়, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেন।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২৪৫)

২. ঋণ পরিশোধ না করলে চোর হিসেবে গণ্য

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا فَهُوَ غَارِمٌ سَارِقٌ

অর্থ: "যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ গ্রহণ করে তা নষ্ট করার

ইচ্ছা রাখে, সে ঋণগ্রস্ত চোর।" (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং: ২৩৪০৭)

৩. ঋণের বোঝা নিয়ে মৃত্যু

نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ

অর্থ: "ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত মুমিনের আত্মা তার ঋণের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে।" (সুনান তিরমিযী, হাদীস নং: ১০৭৮)

৪. নবী ﷺ ঋণগ্রস্তের জানাযা পড়তেন না

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِالرَّجُلِ الْمَيِّتِ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ، قَالَ: هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ فَإِنْ قِيلَ لَا، صَلَّى، وَإِلَّا قَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ

অর্থ: "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে যখন কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযা আনা হতো, তিনি জিজ্ঞেস করতেন, 'তার কোনো ঋণ আছে কি?' যদি বলা হতো না, তিনি জানাযা পড়তেন; আর যদি বলা হতো হ্যাঁ, তবে বলতেন, 'তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযা পড়ো।' (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ২২৯৫)

বর্তমান সমাজে ঋণের প্রসার

আজ ঋণের পরিধি কেবল অভাবগ্রস্তদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বরং তা শহর-বন্দর, গ্রাম-গঞ্জ—সবখানে ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজে এখন গড়ে উঠছে ঋণ-ভিত্তিক অর্থনীতি (Debt-based Economy)।

মানুষ আয়ের সীমার বাইরে গিয়ে বিলাসবহুল জীবন উপভোগে আগ্রহী হচ্ছে। যা নেই তা অর্জনের আশায় অনেকে সুদে ঋণ নিচ্ছে। এই সুযোগে এক শ্রেণীর অর্থ ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠা করেছে নানা নামে ঋণ প্রদান প্রতিষ্ঠান—যেমন: ব্যাংক, ফাইন্যান্স কোম্পানি, এনজিও ইত্যাদি।

এমনকি এই প্রতিষ্ঠানগুলোও অতিরিক্ত মুনাফার আশায় অন্য উৎস থেকে ঋণ নিচ্ছে। ফলে ঋণ এখন সমাজের প্রতিটি স্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

বর্তমান সমাজে অপ্রয়োজনীয় ঋণের কিছু বাস্তব চিত্র

আজকের ভোগবাদী সমাজে অনেক মানুষ ঋণকে অর্থনৈতিক প্রয়োজন নয়, বরং বিলাসিতা ও সামাজিক প্রতিযোগিতার উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করছে। বাহ্যিকভাবে কাউকে দেখে ধনী মনে হলেও বাস্তবে তারা ঋণের ভারে ন্যুব্জ। কেউ কেউ ঋণ পরিশোধে অক্ষম হয়ে দুঃখজনকভাবে মৃত্যুর মুখোমুখি হচ্ছে। আবার অনেকে ইচ্ছাকৃতভাবে ঋণ পরিশোধে গাফিলতি করছে। যার ফলে দিন দিন ব্যাংকিং সেক্টরে খেলাপি ঋণের তালিকা দীর্ঘ হচ্ছে। চারিদিকে চোখ বুলালে অপ্রয়োজনীয় ঋণের অসংখ্য নযীর দেখতে পাই-

১. বিলাসী বিয়ে আয়োজন:

অনেক পরিবার সমাজে মর্যাদা দেখানোর জন্য সামর্থ্যের বাইরে গিয়ে ঋণ নেয়—বিলাসবহুল ভেন্যু, সাজসজ্জা, ও আপ্যায়নের ব্যবস্থা করে। ফলে বিয়ের পর দীর্ঘদিন অর্থনৈতিক কষ্ট ভোগ করতে হয়।

২. ক্রেডিট কার্ডের অযথা ব্যবহার:

বর্তমানে অনেকেই ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেন শুধু বিলাসী কেনাকাটা, রেস্টুরেন্ট বা গ্যাজেট কেনার জন্য। মাস শেষে বিল পরিশোধে ব্যর্থ হয়ে তারা সুদের ঋণে জড়িয়ে পড়ে, যা শরীয়াহ অনুযায়ী সম্পূর্ণ হারাম। এবং এটি অর্থনৈতিক একটি ট্রেপ। যার মধ্যে একবারে পড়ে গেলে বের হয়ে আসা অনেক সময়ই কঠিন হয়ে পড়ে।

৩. মোবাইল ও গ্যাজেট কেনা:

প্রয়োজন না থাকলেও নতুন মডেলের ফোন বা ল্যাপটপ কেনার জন্য ঋণ নেওয়ার প্রবণতা বেড়েছে। এটি অহেতুক মানুষকে ঋণগ্রস্ততার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। যার ফলে অর্থনৈতিক চাপে পড়তে হচ্ছে।

৪. ভ্রমণ ও বিনোদনের জন্য ঋণ:

সামাজিক মাধ্যমে বিলাসবহুল ভ্রমণের ছবি প্রদর্শনের প্রতিযোগিতায় অনেকেই ঋণ বা কিস্তিতে ভ্রমণ করে। ভ্রমণ শেষে দেখা দেয় মানসিক চাপ ও অর্থনৈতিক দূরাবস্থা।

৫. বাড়ি বা অফিস সাজসজ্জা:

অতিরিক্ত সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য ঋণ নিয়ে দামি আসবাব, টাইলস বা চোখ ধাঁধানো ইন্টেরিয়র করা আজ সাধারণ অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, যদিও এসব ব্যয় বাস্তবে প্রয়োজনীয় নয়।

৬. ফ্যাশন ও পোশাকের জন্য ঋণ:

উৎসব বা পার্টিতে আলাদা করে নজর কাড়ার জন্য ঋণ নিয়ে দামি ও ব্র্যান্ডেড পোশাক, ঘড়ি, জুতা কেনা আজ এক ধরনের

সামাজিক চাপ হয়ে উঠেছে।

৭. সন্তানের বিলাসী চাহিদা পূরণ:

অভিভাবকরা সন্তানদের ব্যয়বহুল স্কুল, গ্যাজেট বা শখ পূরণের জন্য ঋণ নেন, যা সন্তানদের মধ্যে অপচয়ের মানসিকতা সৃষ্টি করে। এবং দিনদিন লাগামহীন ব্যয়ের বদ অভ্যাস গড়ে তোলে।

৮. সামাজিক মর্যাদা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা:

নতুন গাড়ি, ফ্ল্যাট, দামি আসবাব বা ব্র্যান্ডেড পণ্যের প্রতিযোগিতায় অনেকেই ঋণের বোঝায় জর্জরিত হয়ে পড়ে।

এসব উদাহরণ দেখায়, আধুনিক মানুষ অনেক সময় প্রয়োজন (Need) ও ইচ্ছা (Want)-এর পার্থক্য ভুলে গেছে। অথচ ইসলাম মানুষকে সংযম, পরিমিত জীবনযাপন ও অপ্রয়োজনীয় ঋণ থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেয়।

হাদীসে ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব

"ঋণ প্রসঙ্গে কত কঠোর বাণী আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন! যাঁর হাতে আমার জীবন, তাঁর শপথ! কেউ যদি ঋণগ্রস্থ অবস্থায় আল্লাহর পথে শহীদ হয়, এরপর বারবার জীবিত হয়ে পুনরায় শহীদ হয়, তবুও সে তার ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।"

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ قُتِلَ رَجُلٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، ثُمَّ أُحْيِيَ، ثُمَّ قُتِلَ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ

(মুস্তাদরাকে হাকিম, সহীহ, হাদীস নং: ২২১২)

অন্য হাদীসে এসেছে —

"শহীদের ঋণ ব্যতীত সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।"

يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং: ১৮৮৬)

ঋণগ্রস্তের জানাযা প্রসঙ্গ

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এক ব্যক্তির জানাযা পড়ানোর জন্য আনা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "তার উপর কি ঋণ আছে?" যখন বলা হলো "হ্যাঁ", তখন নবী ﷺ বললেন, "তোমরাই তোমাদের সাথীর জানাযা পড়ে নাও।"

এ সময় আবু কাতাদা রা. বললেন, "ঋণের দায়িত্ব আমি নিলাম।" নবী ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "পূর্ণভাবে আদায় করবে?" তিনি বললেন, "জি হ্যাঁ।" তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তার জানাযা পড়ালেন।

أُتِيَ بِرَجُلٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ : عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ قَالُوا : نَعَمْ ، دِيْنَارَانِ، فَتَخَلَّفَ عَنْهُ، فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ : هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ

(সুনানে তিরমিযী, হাসান সহীহ, হাদীস নং: ১০৬৯)

উপসংহার

ঋণ মূলত আমাদের জন্য কল্যাণ নয়, বরং ভয়াবহ এক পরীক্ষা। এটি মানসিক শান্তি কেড়ে নেয়, সামাজিক লজ্জা ডেকে আনে। তাই যতটুকু সম্ভব ঋণ এড়িয়ে চলা উচিত এবং আল্লাহর কাছে ঋণমুক্তির জন্য দোয়া করা উচিত।

ঋণমুক্তির দোয়া

হযরত আলী রা. বলেন — রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ঋণমুক্তির এমন দোয়া শিখিয়েছেন, যদি পাহাড়সমান ঋণও হয়, তবুও আল্লাহ তা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেবেন।

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

"হে আল্লাহ! আপনি হারাম থেকে বাঁচিয়ে হালালকে আমার জন্য যথেষ্ট করুন, এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্য সবার মুখাপেক্ষী হওয়া থেকে মুক্ত করুন।" (জামে তিরমিযী, হাসান গরীব, হাদীস নং: ৩৫৬৩)

আরেক দো'আয় তিনি বলতেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই দুঃখ ও দুশ্চিন্তা থেকে, অক্ষমতা ও অলসতা থেকে, কাপুরুষতা ও কৃপণতা থেকে, এবং ঋণের বোঝা ও মানুষের আধিপত্য থেকে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং: ৬৩৬৯)

সমাপ্তি

সুতরাং, আমাদের উচিত আল্লাহর উপর ভরসা রাখা। হালাল আয়-উপার্জনের প্রতি যত্নশীল হওয়া। সাধ্যের মধ্যে জীবনযাপন করা। অপ্রয়োজনে ঋণ থেকে বিরত থাকা। এবং সমাজে সত্যিকারের অভাবীদের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে ঋণমুক্ত জীবন ও সুদ থেকে নিরাপদ থাকার তাওফিক দান করুন। আমীন।

লেখক: মুফতী আহসানুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক, মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী, ঢাকা।

মাহে রমযান ও আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য

মাওলানা মুহাম্মদ সানাউল্লাহ

মাহে রমযান সমাগত। মুমিনের জীবনে পবিত্রতার বার্তা নিয়ে আসে মাহে রমযান। মাহে রমযান পবিত্রতার মাস। অস্বচ্ছতা থেকে পবিত্রতার মাস। ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে পবিত্রতার মাস। জুলুম ও অন্যায় থেকে পবিত্রতার মাস। এ মাস পরকালের ব্যবসার মাস। আখেরাতের পাথেয় গোছানোর মাস। কিন্তু আমাদের অনেকের জীবনে রমযান আসে ভিন্ন বার্তা নিয়ে। আমরা রমযানকে দুনিয়ার ব্যবসার সবচেয়ে বড় মৌসুম বানাই। সম্পদ উপার্জনের মোক্ষম সুযোগ মনে করি। রমযানের পবিত্রতার বার্তাকে পেছনে ঠেলে দিয়ে অন্যায় ও জুলুমের পথকে বেছে নেই।

রমযান এলেই আমাদের অনেকের ব্যস্ততা বেড়ে যায়। সারা বছর যে কামাই হয়নি, রমযানে তা হাসিল করার চেষ্টা করি। সবজি বিক্রেতারা সবজির দাম বাড়িয়ে দেই। ফল বিক্রেতারা ফলের দাম বাড়িয়ে দেই। প্রতিটি পণ্য চলে যায় ক্রেতা সাধারণ ও রোজাদারদের নাগালের বাইরে। যার ফলে স্বাচ্ছন্দ্যে সাহরি ইফতার করার তাওফীক অনেক পরিবারের হয়ে উঠে না। রমযান এলেই দৈনিক পত্রিকাগুলোতে 'রোজার পণ্যে অগ্নিমূল্য, অসহায় ভোক্তা', 'গরু ও মুরগির মাংসের দাম নাগালের বাইরে', 'রোজায় অস্থির নিত্যপণ্যের বাজার', 'ছোট তরমুজ পিস ৮০, কেজি ৯০' ইত্যাদি শিরোনামগুলো চোখে পড়ে। নানান ধরনের সিন্ডিকেট আর ধোঁকা প্রতারণার সয়লাব দেখা যায় রমযানকে কেন্দ্র করে।

একই দৃশ্য দেখা যায় মার্কেট, শপিং মল আর বিপণী বিতানগুলোতেও। খুব জাঁকজমক আর বাহারি আইটেমে সাজিয়ে তোলা হয় রমযানের প্রথম দিন থেকেই। চলতে থাকে এক অদম্য ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা গোটা রমযান মাস জুড়ে। ব্যবসার জন্য ছাড়া হয় নামায, ছাড়া হয় তারাবি। ছাড়া হয় এই পবিত্র মাসের ইবাদতগুলো। এমনকি রোজা পর্যন্ত ছেড়ে দেন অনেক ব্যবসায়ি। সেই সাথে আছে ধোঁকা, প্রতারণা। কথায় কথায় মিথ্যা বলা। ক্রেতা সাধারণকে কথার ফাঁদে ফেলে আলোর ঝলক দেখিয়ে বোকা বানিয়ে অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি করা।

বিশেষ করে রমাদানের শেষ দশকে। যখন আল্লাহর রহমতের অবারিত বারিধারা বর্ষিত হতে থাকে। যখন পুরো পৃথিবী আল্লাহর দয়ার চাদরে আবৃত হয়। যখন আল্লাহ তার বান্দাদের জন্য সারা বছরের শ্রেষ্ঠ উপহার হাজার রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ রাতটি দান করেন। যখন সময় আসে নাওয়া খাওয়া ভুলে গিয়ে আল্লাহর দরবারে লুটিয়ে পড়ার। তখন একদল ব্যবসায়ী নিমজ্জিত থাকে দুনিয়ার সম্পদ উপার্জনে। ঈদের বাজার থেকে বছরের সর্বোচ্চ মুনাফা উঠিয়ে নিতে নির্ঘুম রাত কাটে। রাত্রী জাগরণ হয়, কিন্তু রবের দরবারে একটি সিজদা দেয়ার তাওফীক হয় না।

পবিত্র রমাদানে ইবাদাতের শ্রেষ্ঠ মৌসূমে ব্যবসার এই মিথ্যা প্রতিযোগিতা মুমিনের জীবনে কিছুতেই কাম্য নয়। ব্যবসাকে আল্লাহ তাআলা বরকতময় পেশা বানিয়েছেন। এতে রেখেছেন মুমিনের জন্য অফুরন্ত বারাকাহ ও হালাল রিজিক। তবে শর্ত হলো, এই ব্যবসা হতে হবে নৈতিক ব্যবসা। ব্যবসা হতে হবে সৎ ব্যবসা। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সৎ ব্যবসায়ির মর্যাদা বর্ণনা করে বলেছেন,

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ، وَالصِّدِّيقِينَ، وَالشُّهَدَاءِ

অর্থ : সত্যবাদী, আমানতদার ব্যবসায়ী জান্নাতে নবীগণ, সিদ্দিকগণ এবং শহীদগণের সাথে থাকবে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস ১২০৯)

এ মর্যাদা তাদের জন্যই যারা ব্যবসায় নৈতিকতা রক্ষা করবে। যারা ব্যবসার পাশাপাশি আল্লাহর হকসমূহও যথাযথ আদায় করবে। তাই ব্যবসায়ী ভাইদের উচিত রমযানে ব্যবসার ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা।

হালাল ব্যবসা নিশ্চিত করা

ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রথম কর্তব্য হলো, হালাল ব্যবসা নিশ্চিত করা। হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা পবিত্র, তিনি পবিত্রতা ছাড়া কোন কিছু গ্রহণ করেন না।" অন্য এক হাদীসে এসেছে, হযরত আবু বারযা আসলামী রা. থেকে বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِه فِيمَ أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِه فِيمَ فَعَلَ، وَعَنْ مَالِه مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَه وَفِيمَ أَنْفَقَه، وَعَنْ جِسْمِه فِيمَ أَبْلَاه.

অর্থ : কেয়ামতের দিন কোন বান্দার পা যুগল সামনে অগ্রসর হতে পারবে না, যাবত না তাকে তার জীবন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কিভাবে তা অতিবাহিত করেছে। তার ইলম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কী পরিমাণ সে অনুযায়ী আমল করেছে। তাকে তার সম্পদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কোথা থেকে তা উপার্জন করেছে আর কোথায় ব্যয় করেছে। তাকে তার দেহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে, কিভাবে তা ক্ষয় হয়েছে। (সুনানে তিরমিযী, হাদীস ২৪১৭)

লক্ষ করুন, কেয়ামতের মাঠে কঠিন পাঁচটি প্রশ্নের দুটিই হবে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় সম্পর্কে। অন্য দৃষ্টিতে দেখলে, কেয়ামতের সেই কঠিন মুহূর্তে যে প্রশ্নগুলোর জবাব বান্দাকে অবশ্যই দিতে হবে, যার উত্তর দেয়া ছাড়া এক কদমও সামনে বাড়ার ক্ষমতা থাকবে না, তার ৪০% হবে সম্পদের উপার্জন ও ব্যয় সম্পর্কে। হালাল ও হারাম সম্পর্কে। এই বিষয়গুলো কি আমাদেরকে ভাবতে শেখায় না!

ব্যবসায় হালাল নিশ্চিত করতে হবে দুই দিক থেকে।

১. পণ্য হালাল হওয়া। হারাম পণ্য, নাজায়েজ পণ্যের ব্যবসা করা যাবে না। চুরির মাল বেচাকেনা করা যাবে না। না জায়েজ পোষাকের ব্যবসা করা যাবে না। না জায়েজ কাজে ব্যবহৃত হয় এমন পণ্যের ব্যবসা করা যাবে না।

২. পদ্ধতি হালাল হওয়া। সকল ধরনে হারাম উপাদান থেকে বিরত থাকা। সুদ, ঘুষ, জুয়া, কিমার, জাহালাহ, গারার, ধোঁকা ও প্রতারণা, অন্যায় সিন্ডিকেট থেকে মুক্ত থাকা।

ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকা

ব্যবসায় সব ধরনের ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। ব্যবসায় মিথ্যা বলা, মাপে কম দেয়া, মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য দিয়ে দেয়া, পণ্য সম্পর্কে ভুল তথ্য দেয়া, পণ্যের এমন গুণাগুণ বর্ণনা করা যা তার মাঝে নেই ইত্যাদি ব্যবসায় প্রতারণার অংশ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন,

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ (٣) أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ (٤) لِيَوْمٍ عَظِيمٍ (٥) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (٦)

অর্থ : দুর্ভোগ তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়, যারা লোকদের থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূর্ণমাত্রায় গ্রহণ করে, আর যখন তাদের জন্য পরিমাপ করে তখন কমিয়ে দেয়। তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা পুনরুত্থিত হবে? এক মহাদিবসে, যেদিন সমস্ত মানুষ রব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়াবে। (সূরা মুতাফফিফীন (৮৩) : ১-৬)

শুধু ওজনে কম দেয়াই 'মাপে কম দেয়া' নয়। পণ্যের কোয়ালিটি খারাপ দেয়া, মানে খারাপ দেয়াও মাপে কম দেয়া। লোকাল পণ্য ব্র্যান্ডের নামে চালিয়ে দেয়াও মাপে কম দেয়া। ঈদের বাজারে এই গুনাহটির ব্যাপক চর্চা হয়। মিথ্যা যেনো ব্যবসায়ীদের অভ্যাসে পরিণত হয়। মানুষকে মিথ্যা বলে, কথার মারপ্যাঁচে ফেলে, আলোর ঝলক দেখিয়ে প্রতারিত করা হয়।

এই ধোঁকা ও প্রতারণা, মিথ্যা এবং মিথ্যা শপথ ব্যবসার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ব্যবসার বরকতকে নষ্ট করে দেয়। নবীজী বলেন,

إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ، فَإِنَّهُ يُنْفِقُ، ثُمَّ يَمْحَقُ-

অর্থ : তোমরা বেচাকেনায় অত্যাধিক কসম করা থেকে বেঁচে থাক, কেননা তা পণ্যকে বাজারে অচল করে দেয়, আর

ব্যবসার বরকতকে নষ্ট করে দেয়। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৬০৭)

সব ধরনের সিন্ডিকেট ভেঙ্গে দেয়া

আমাদের দেশে রমযানকে কেন্দ্র করে অসাধু ব্যবসায়িদের বড় বড় সিন্ডিকেট গড়ে ওঠে। সবজি বাজার, ফলের বাজার থেকে নিয়ে নিত্য পণ্যের বাজারও এই সিন্ডিকেটের হাতে কোণঠাসা হয়ে পড়ে। ক্ষতির শিকার হয় ক্রেতা সাধারণ। মাসব্যাপী নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে অনেকেই হাঁপিয়ে ওঠে। স্বাস্থসম্মত দুবেলা সাহরী ইফতারের ব্যবস্থা করাও কঠিন হয়ে পড়ে অনেক পরিবারের।

এটি সুস্পষ্ট জুলুম। মারাত্মক অন্যায়। রোযাদারের মুখের গ্রাস নিয়ে অন্যায় মুনাফা কামানো। হাশরের ময়দানে এর জন্য কঠিন জবাবদিহিতার শিকার হতে হবে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ- অর্থ : পাপীরাই কেবল ইহতিকার করে। (সহীহ মুসলিম, হাদীস ১২০৬)

ব্যবসায়ী ভাইদের উচিত এধরনের সিন্ডিকেটকারীদের প্রতিহত করা। রমযানে এবং রমযানের বাইরে। অন্যায় সিন্ডিকেট সব সময়ই না জায়েজ। তাই সিন্ডিকেটগুলোকে ঐক্যবদ্ধভাবে ভেঙ্গে দিতে হবে।

আর সিন্ডিকেটকারীদেরও উচিত আল্লাহকে ভয় করা। রাতারাতি সম্পদশালী হওয়ার নেশা থেকে বের হয়ে আসা। এই সম্পদ আত্মসাতের সম্পদ, এই সম্পদ অন্যায় ও জুলুমের সম্পদ, এই সম্পদ রোযাদারের মুখের গ্রাস কেড়ে নেয়া সম্পদ। এধরনের হারাম সম্পদ উপার্জন থেকে বের হয়ে হালাল উপার্জন ও নৈতিক ব্যবসায় আত্মনিয়োগের সময় এখনই। রমযান মাসই তার উত্তম মৌসুম।

উদার ও মহানুভব হওয়া

ব্যবসায়ীদের উদার ও মহানুভব হওয়া চাই। বিশেষত রমযান মাসে। রোযাদারদের প্রতি উদারতা প্রদর্শন করা, তাদের জন্য ভালো পণ্য সুলভ মূল্যে প্রদান করা ব্যবসায় মহানুভবতার পরিচয়। নেককার, আস্থাভাজন, ভালো মানুষদের হাতে টাকা না থাকলে বাকিতে পণ্য দেয়া। রোযাদারদের জন্য যথাসম্ভব পণ্যের মূল্য কমিয়ে রাখা, কম মুনাফা করা। এভাবে রমযানে রোযাদারদের প্রতি উদারতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ব্যবসাকে ইবাদাতে রূপান্তর করা সম্ভব। যা রমযানে দৃশ্যত কম ইবাদাত করা হলেও দিনশেষে নেকীর ভাণ্ডারকে অনেক বেশি সমৃদ্ধ করবে।

হাদীসে এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "যে ব্যক্তি কোন রোযাদারকে ইফতার করাবে, সে তার সমান সওয়াব লাভ করবে।" -সুনানে তিরমিজি, হাদীস ৮০৭।

মাহে রমযানে ইফতার সামগ্রি বিক্রিতে ১০ টাকা কম রেখে আমরা কিন্তু রোযাদারদেরকে ১০ টাকা পরিমাণ ইফতার করাতে পারি।

উদারতা ও মহানুভবতা ব্যবসায় বারাকাহ ও রহমত আনে। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রা. বর্ণিত, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,

رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمْحًا، إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى-

অর্থ : আল্লাহ এমন ব্যক্তির প্রতি রহম করুন, যে ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এবং ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির কাছে ঋণ চাওয়ার সময় উদারতা প্রদর্শন করে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২০৭৬

আমরা কি আমাদের ব্যবসায় আল্লাহর দয়া ও রহমতের প্রত্যাশী না?

অতএব আসুন, আমরা রমযানকে ব্যবসার মৌসুম না বানিয়ে ইবাদতের মৌসুম বানাই। আসুন, রমযানে প্রচলিত ব্যবসার রূপটাকে পাল্টে দেই। অন্যায় সিন্ডিকেটগুলো ভেঙ্গে দেই। ব্যবসাকে বানাই সৃষ্টির সেবা আর সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যম। তবেই আমরা সফল ব্যবসায়ী হবো, দুনিয়া এবং আখেরাতে।

লেখক: মাওলানা মুহাম্মদ সানাউল্লাহ, শিক্ষক, মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী

আসাদুল্লাহ, মুন্সিগঞ্জ

প্রশ্ন: জনাব আসাদুজ্জামান সাহেব একটি সুদী ব্যাংকে ১০ লাখ টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী তিনি প্রতি মাসে ৩.৫% সুদে ৫ বছর পর ২,১০,০০০ টাকা ইন্টারেস্ট পেয়েছেন। তিনি এই সুদের টাকা দিয়ে একটি জমি ক্রয় করেছেন। কিছুদিন পর জমির দাম বৃদ্ধি পেলে তিনি জমিটি ৫০,০০০ টাকা লাভে বিক্রি করে দেন। জানার বিষয় হলো, এই ৫০,০০০ টাকা কি জনাব আসাদুজ্জামান সাহেবের জন্য বৈধ হবে?

উত্তর: প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে যদি সুনির্দিষ্টভাবে সুদের টাকা থেকেই জমির মূল্য পরিশোধ করা না হয়ে থাকে (সাধারণত যেমনটা হয়), বরং জমি ক্রয় করে একাউন্ট থেকে সেই পরিমাণ টাকা উত্তোলন করে মূল্য পরিশোধ করা হয়, তবে এই জমি বিক্রি করে প্রাপ্ত লাভ ৫০,০০০ টাকা জনাব আসাদুজ্জামান সাহেবের জন্য বৈধ হবে। আর ইন্টারেস্ট এর ভিত্তিতে প্রাপ্ত ২,১০,০০০ টাকা সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিতে হবে।

সূত্র: ফাতাওয়া বাযযাযিয়া ৩/৯১, আল বাহরুরর রায়েক ৮/২০৭, রদ্দুল মুহতার ১৫/৪৪১

শাব্বির আহমদ, পাবনা

প্রশ্ন: মুহতারাম, আমার অফিসে প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা ডিউটির জন্য একজন ইমপ্লয়কে নিয়োগ দিতে চাচ্ছি। এক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কাজ উল্লেখ করে দেওয়া কি আবশ্যক? নাকি কাজ নির্দিষ্ট করা ছাড়াও নিয়োগ চুক্তি বৈধ হবে?

উত্তর: এ ধরনের প্রাইভেট নিয়োগ চুক্তিতে বিস্তারিতভাবে কাজের ধরন ও প্রকার উল্লেখ করা আবশ্যক নয়। কাজ সম্পর্কে মৌলিক ধারণা দেয়াই যথেষ্ট।

সূত্র: বাদায়ে‘ ৪/১৮৪, ইতরে হেদায়া, পৃ. ২৩৫

মাহফুজুর রহমান, টাঙ্গাইল

প্রশ্ন: মুহাতারাম, আমি আমার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের অফিস হিসাবে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়েছি। ফ্ল্যাটটি বেশ বড় হওয়ায় দুইটি কামরা আমার প্রয়োজন হয় না। অতিরিক্ত থাকে। আমার জন্য কি এই দুইটি কামরা Sublease দেওয়া বৈধ হবে?

উত্তর: হ্যা, বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা না থাকলে সমস্যা নেই।

সূত্র: আল মুহিতুল বুরহানী ১১/২৬৮, মাজাল্লাতুল আহকামিল আদলিয়্যাহ, ধারা ৫৮৭, আল মাআইরুর শারইয়্যাহ ৯: ৩/৩

শামিম আহমাদ, শরিয়তপুর

প্রশ্ন: আমার চাচা জনাব আব্দুর রহিম একজন ধনী মানুষ। তিনি গ্রামের দরিদ্র লোকদেরকে এক বছর বা দুই বছরের মেয়াদে রিকশা, ধানের মেশিন, সেলাই মেশিন ইত্যাদি কেনার জন্য নগদ টাকা প্রদান করেন। মেয়াদ শেষে তারা সেই টাকা মুনাফাসহ পরিশোধ করে। এই মুনাফা নেয়া বৈধ হবে কি?

উত্তর: প্রশ্নোক্ত মুনাফা গ্রহণ বৈধ নয়। বরং তা ঋণের উপর অতিরিক্ত গ্রহণ। যা কুরআনে নিষিদ্ধ সুস্পষ্ট রিবা। অতএব, জনাব আব্দুর রহিম সাহেবের কর্তব্য হল, ইতিপূর্বে এ ধরনের সুদের ভিত্তিতে যত মুনাফা গ্রহণ করেছেন তা তার মূল মালিক বা তার ওয়ারিশদের কাছে পৌঁছে দেয়া। আর যদি মালিক জানা সম্ভব না হয়, তাহলে সওয়াবের নিয়ত ব্যতীত সদকা করে দেওয়া।

সূত্র: সুনানে কুবরা, বায়হাকী ৫/৫৭৩, ফাতহুল কাদীর ৭/৩, আল মুগনি ৪/২১১

ইসলামী অর্থনীতির ব্যক্তিত্ব পরিচিতি

ইসলামী অর্থনীতির ব্যক্তিত্ব পরিচিতি (২)

ড. রফিক ইউনুস আল মিসরি

ড. রফিক ইউনুস আল মিসরি বর্তমান সময়ে বিশ্বময়ী ইসলামী অর্থনীতি চর্চা ও গবেষণার একজন অন্যতম দিকপাল ছিলেন। ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানের সকল শাখায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত একজন ইসলামী স্কলার ছিলেন। বিশেষ করে তাফসীর, ইসলামী উত্তরাধিকার আইন ও ইসলামী অর্থনীতিতে অত্যন্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন।

তিনি ১৯৪২ সালে সিরিয়ার দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দামেস্কেই বেড়ে উঠেছেন এবং সেখানেই প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি ১৯৬৫ সালে 'জামিয়া দিমাস্ক' থেকে একাউন্টিংয়ে স্নাতক সম্পন্ন করেন। এরপর ১৯৭৫ সালে ফ্রান্সের 'ইউনিভার্সিটি অব রিনস' থেকে অর্থনীতিতে ডক্টরেট অর্জন করেন।

কর্মজীবনে তিনি ১৯৮১ সালে সৌদি আরবের 'জামিয়াতুল মালিক আব্দুল আজীজে'র ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণাকেন্দ্রে গবেষক হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৮৪-১৯৯৬ পর্যন্ত সেখানে শিক্ষকতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি 'ওআইসি' (Organisation of Islamic Cooperation (OIC) এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য ছিলেন। 'মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী, জেদ্দা'রও গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।

তিনি তার গবেষণা ও লিখনীর মাধ্যমে ইসলামী অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করেছেন। ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ক তার প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা অর্ধ শতাধিক। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

১. আল ই'যাযুল ইকতিসাদি লিল কুরআনিল কারীম
২. উসূলুল ইকতিসাদিল ইসলামী
৩. আল জামে' ফী উসূলির রিবা

বর্ণাঢ্য জীবন শেষে তিনি ২০২১ সালের ১৯ই জুলাই ৮০ বছর বয়সে সিরিয়ায় ইন্তিকাল করেন।

ইসলামী অর্থনীতির গ্রন্থ পরিচিতি

ইসলামী অর্থনীতির গ্রন্থ পরিচিতি (২)

কিতাবুল কাসব

'কিতাবুল কাসব' ইমাম মুহাম্মদ রহ. (মৃত্যু : ১৮৯ হি.) রচিত ইসলামী অর্থনীতির কিতাব। ইতিহাসে এটিই ইসলামী অর্থনীতি বিষয়ে প্রথম স্বতন্ত্র গ্রন্থ। যা ২য় হিজরী শতাব্দিতে লেখা হয়।

এই কিতাবে মৌলিকভাবে উপার্জনের ইসলামী রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছে। উপার্জনের বৈধ প্রকারসমূহ, সেগুলোর বৈধতার দলিল ও শরঈ নীতিমালাসমূহ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। একইভাবে ইসলামী অর্থনীতির আলোকে সম্পদ ব্যয়ের নীতিমালা ও রূপরেখাও সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। সর্বপরি মানব জীবনে সম্পদ উপার্জন ও ব্যয়ে হালাল হারাম নিয়ে এই কিতাবে সারগর্ভ আলোচনা রয়েছে।

ইমাম মুহাম্মদ রহ. সম্পদ উপার্জনের চারটি মাধ্যম নিয়ে আলোকপাত করেছে- ব্যবসা, চাষাবাদ, ইজারা ও শিল্প। এছাড়াও বর্তমান সময়ে আলোচিত মাইক্রো ইকোনোমির বিভিন্ন দিক নিয়ে এই কিতাবে আলোচনা রয়েছে। তুর্কি গবেষক ড. আদনান ওয়াইদা তার গবেষণা প্রবন্ধ بواكير الفكر الاقتصادي الإسلامي منذ فجر الإسلام তে কিতাবুল কাসব সম্পর্কে বলেছেন, أول كتاب يناقش قضايا في الاقتصاد الجزئي كتاب الكسب. 'এটি প্রথম গ্রন্থ, যেখানে মাইক্রো ইকোনোমির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা রয়েছে।'

কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ রহ. এর তাহকীকসহ দারুল বাশাইরিল ইসলামিয়্যাহ, বাইরুত থেকে। (১ম প্রকাশ, ১৯৯৭)

গবেষক ড. সালেহ হামিদ 'কিতাবুল কাসবে ইমাম মুহাম্মাদ রহ. এর অর্থনৈতিক চিন্তা ও দর্শন' এর উপর স্বতন্ত্র গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তার গবেষণার শিরোনাম- الأفكار الإقتصادية عند محمد بن الحسن الشيباني في كتابه "الكسب"। প্রবন্ধটি কুয়েতের Journal of sharia and islamic studies-এর ৭৪ নং সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

মারকাযু দিরাসার দিন রাত

ফিকহী মজলিস ২০২৫

১৪ আগস্ট ২০২৫, রোজ বৃহস্পতিবার মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত হয় সরকারি সুকুক ও সামাজিক ব্যবসা নিয়ে বিশেষ ফিকহী মজলিস। উক্ত ফিকহী মজলিসে সরকারি সুকুক ও সামাজিক ব্যবসা নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন এবং আলোচনা পর্যালোচনা করেন দেশের বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম।

সরকারি (সভেরিন) সুকুক নিয়ে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী (CIES)-এর পরিচালক ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান হাফি.। এর উপর মতামত, আলোচনা ও পর্যালোচনা পেশ করেন উপস্থিত শরীয়াহ বিশ্লেষক ও মুফতীগণ।

এরপর সামাজিক ব্যবসা ও তার ইসলামিক দৃষ্টিকোণ নিয়ে আলোচনা পর্যালোচনা হয়। এ বিষয়ে বিশদ গবেষণামূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম হাফি.। উক্ত প্রবন্ধে প্রচলিত সামাজিক ব্যবসার বিকল্প হিসাবে ইসলামী অর্থনীতিতে সামাজিক ব্যবসার রূপরেখা তুলে ধরা হয়। উপস্থিত মুফতীগণ এর উপর আলোচনা পর্যালোচনা করেন এবং দেশে সামাজিক ব্যবসার ইসলামী বিকল্প প্রসারের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উক্ত ফিকহী মজলিসে উপস্থিত ছিলেন মুফতী শাহেদ রহমানী, মুফতী আতীকুর রহমান খান, মুফতী মাসুম বিল্লাহ, মুফতী মুহাম্মদ উল্লাহ, মুফতী আব্দুল মালেক, মুফতী আরিফুল ইসলাম, মুফতী লোকমান হাসানসহ দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন ফতোয়া বিভাগের দায়িত্বশীল বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম।

আলোচনা শেষে সকলের উপস্থিতিতে মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামীর মুখপত্র 'ত্রৈমাসিক ইসলামী অর্থনীতি ও ফাইন্যান্স' পত্রিকার শুভ উদ্বোধন ও মোড়ক উন্মোচন হয়।

NLI Securities Limited ভিজিট

১৬ ই জুলাই ২০২৫, প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-উস্তাদসহ NLI Securities Limited ভিজিটে যাওয়া হয়। আমাদের ২য় বর্ষের ১ম সেমিষ্টারের মৌলিক বিষয় ক্যাপিটাল মার্কেট ও শেয়ার বাজার এর প্র্যাক্টিক্যাল ক্লাস হিসাবেই এই ভিজিটের আয়োজন।

NLI Securities Limited একটি ব্রোকার হাউজ। যারা বিও একাউন্ট ওপেনিং থেকে নিয়ে শুরু করে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে থাকে। আমরা সকাল ১২ টায় সেখানে পৌঁছি। সেখানের Chief Executive Officer জনাব শাহেদ ইমরান সাহেব (CSAA) আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানান। আমরা দীর্ঘ সময় তার সাথে মতবিনিময় করি। Securities Exchange এর নানান বিষয় নিয়ে কথা হয়। কথার ফাঁকে ফাঁকে হয় প্রশ্নোত্তর। জনাব শাহেদ ইমরান সাহেব অত্যন্ত ধৈর্য ও আন্তরিকতার সাথে ছাত্রদের সকল প্রশ্নের উত্তর দেন। নিজে থেকেও নানান বিষয় সম্পর্কে জানান।

আলোচনা পর্ব শেষ হওয়ার পর তিনি ছাত্রদেরকে পুরো অফিসটি ঘুরিয়ে দেখান। কোন ডিপার্টমেন্টে কী কাজ হয়, কিভাবে হয় সব কিছুর বাস্তবিক প্র্যাক্টিস দেখে ছাত্ররা অভিভূত হয় ও অত্যন্ত উপকৃত হয়। সর্বশেষ তিনি আমাদেরকে মূল ট্রেডিং রুমে নিয়ে যান। সেখানে বড় স্ক্রিনে শেয়ারের মূল্যের উঠা-নামা, ট্রেডিং পদ্ধতি, ইনডেক্স ইত্যাদি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে দেখান।

মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী

مركز دراسات الاقتصاد الإسلامي ◆ CENTRE FOR ISLAMIC ECONOMICS STUDIES

গবেষণামূলক উচ্চতর ইসলামী অর্থনীতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

১৪৪৭-৪৮ হি.

ভর্তি বিজ্ঞপ্তি

ভর্তির তারিখ
৭ই শাওয়াল থেকে
৯ই শাওয়াল

ভর্তির যোগ্যতা
হাইআতুল উলয়ায় মুমতায
বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া

প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

- ফিকহ ও ইকতিসাদে ইসলামীতে দুই বছর মেয়াদি তাখাসসুস বিভাগ।
- প্রাচীন ফিকহ ও আধুনিক ফিকহের সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন সিলেবাসে পাঠদান।
- অর্থনীতির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতিবিদ আলেম ও প্র্যাক্টিশনারদের মুহাযারা।
- এক্সপার্টারের মাধ্যমে বেসিক একাউন্টিং, ইংলিশ ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ।
- বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মাঠ পর্যায়ে এ্যানালাইসিস ও ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা।
- এ্যাওফি (AAOIFI) ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইসলামিক ফাইন্যান্সে উচ্চতর সার্টিফিকেট অর্জনের যোগ্যতা সৃষ্টি।

ভর্তি পরীক্ষার বিষয়

মৌখিক: ফাতহুল কাদীর (কিতাবুল বুয়ু)
লিখিত: হেদায়া কিতাবুল বুয়ু ও ফিকহুল বুয়ু
প্রবন্ধ: বাংলা ও আরবি

ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

- মেশকাত ও তাকমীলের বোর্ড পরীক্ষার নম্বরপত্র
- পূর্বের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রত্যয়নপত্র
- নিজের ও পিতা মাতার জাতীয় পরিচয়পত্র
- দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি

শিক্ষা বিষয়ক সার্বিক তত্ত্বাবধানে
মুফতী আব্দুল্লাহ মাসুম হাফি.
সিনিয়র সহকারী মুফতী,
জামিয়া শারইয়্যাহ মালিবাগ, ঢাকা

আরজ গুজার
ড. মুফতী ইউসুফ সুলতান হাফি.
পরিচালক,
মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী

মুফতী আতিকুর রহমান খান
প্রতিষ্ঠাতা,
মারকাযু দিরাসাতিল ইকতিসাদিল ইসলামী

ঠিকানা : বাড়ি – ০৭ (২য় তলা), রোড – ০৪, ব্লক-এইচ, বনশ্রী (মেরাদিয়া বাজার সংলগ্ন), রামপুরা, ঢাকা
যোগাযোগ : 01676-599373, 01991-999479